পদাবলির চণ্ডীদাস :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস নামে অজস্র কবির নাম পাওয়া যায়। কবি-সাধক চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলিতে সহজ সুরে ভাব-গভীর কথা শুনিয়েছেন। তাঁর কোনো পদই সুস্পষ্টভাবে কোনো রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর রচিত পূর্বরাগের পদে আত্মনিবেদনের সুর কিংবা বিরহের স্তরে বিরহোত্তীর্ণ অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। আক্ষেপানুরাগের পদ রচনায় তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর রচিত পদগুলিতে পূর্বরাগ পর্যায়ে আত্মহারা রাধাচিত্র যেমন উদ্ভাসিত, তেমনই কৃষ্ণচরিত্রের আকুলতাও প্রস্ফুটিত। 'বাসকসজ্জা' পর্যায়ে মিলন ঔৎসুক্য, হাহাকার, বেদনা, 'খন্ডিতা' পর্যায়ে বঞ্চনার ক্ষোভ, আক্ষেপানুরাগে কৃষ্ণপ্রেম পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার নৈরাশ্য ঘুচে গিয়ে 'নিবেদন' পদে চণ্ডীদাসের রাধা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের পদে সমর্পণ করেছেন। 'মাথুর' পর্যায়ে আবার রাধার বিরহ-যন্ত্রণার চিত্রায়ণ ঘটেছে। 'ভাবসম্মিলন' স্তরেও রাধার মনে দুঃখের স্মৃতি। চণ্ডীদাস মূলত বিরহেরই কবি। বিষাদের করুণ রাগিণীই তাঁর কাব্যবীণায় বেজেছে মরমী সুরে।

বিদ্যাপতি : 'মৈথিল কোকিল' :

'বিদ্যাপতি' একাধিক কবি পন্ডিতের নাম অথবা উপনাম। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি বিহারের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা জেলার (অধুনা মধুবনি মহকুমা/মিথিলা) বিস্‌ফি গ্রামে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর তিরোধান হয়। তিনি রাজা শিবসিংহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কুলধর্মে শৈব বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদ রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর প্রশ্নাতীত অধিকার ছিল। সংস্কৃত ব্যতীত স্থানীয় উপভাষা অবহট্‌ঠেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত প্রথম রচনা কীর্তিলতা লেখা হয়েছিল রাজা কীর্তিসিংহের আমলে। বইটি অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা গদ্যে-পদ্যে গ্রথিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য। বিষয় কীর্তিসিংহের কীর্তি, পৈতৃক রাজ্যখন্ড উদ্ধার। তাঁর পরবর্তী রচনা সংস্কৃতে লিখিত ভূপরিক্রমা (অপ্রকাশিত) কীর্তিসিংহের আত্মীয় দেবসিংহের আশ্রয়ে। দেবসিংহের পুত্র শিব সিংহের আশ্রয়ে লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে ও অবহট্‌ঠে লেখা কীর্তিপতাকা (অপ্রকাশিত) এবং লৌকিক ও ঐতিহাসিক কাহিনিগ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা'। 'পুরুষ পরীক্ষা' রচনা শেষ হওয়ার আগেই শিব সিংহের মৃত্যু হয়। দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়ে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পত্রদলিল 'লিখনাবলী' লিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর নামে 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে পদাবলির কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। চৈতন্যদেব তাঁর পদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। বাঙালি বৈষ্ণব পাঠক ও কবিদের কাছেও তাই তিনি স্মরণীয়। শুধু গানে ব্যবহৃত একপ্রকার কৃত্রিম ভাষায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছিলেন। এ ভাষা পরবর্তী সময়ের বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে এবং বৈষ্ণব পদে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ব্রজবুলি ভাষার অনুবর্তন ঘটিয়েছেন। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় আটশো পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় জয়দেবের অনুসরণ লক্ষ করে তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর পদাবলির বাংলা অনুবাদ করে কবিরঞ্জন 'ছোটো বিদ্যাপতি' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। বাঙালি তিনি ছিলেন না, বাংলাতে পদও তিনি রচনা করেননি, তবু তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হল এই যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই তাঁর উৎকৃষ্ট পদের সঙ্গে বাঙালির পরিচিতি, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নির্ভর রচনার প্রতি বাঙালির অন্তরের টান, পরবর্তীকালে বাঙালি

কবিসমাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদরচনার প্রবণতা। বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন রসপর্যায়—যেমন, বয়:সন্ধি, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতির পদরচনায় তিনি অনবদ্য ছিলেন।

মিথিলারাজ শিবসিংহের সুহৃদ এই কবি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, স্মৃতি-শাস্ত্র-সংহিতায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কবি জয়দেবের ভাবাদর্শ, রচনারীতি, সংস্কৃত কবিতা এবং ভাগবতের লীলাকাহিনির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে 'শৈবসর্বস্বহার', 'বিভাসাগর', 'দানবাক্যাবলী', প্রভৃতি। বারংবার মুসলিম আক্রমণে বিপর্যস্ত মিথিলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের রাজ-অর্পিত দায়িত্ব বিদ্যাপতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কর্ণধার ও শৈব বংশোদ্ভূত হলেও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের প্রতি তাঁর সমদর্শিতার পরিচয় মেলে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব-মতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁকে পঞ্চোপাসক হিন্দু (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য) বলেই গণ্য করতে হবে।' বিদ্যাপতি মৈথিলি ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনা করলেও তাঁর রচনায় বহু বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই মৈথিলি-বাংলার মিশ্রণে গড়া ভাষাই হল ব্রজবুলি। পরবর্তীকালের বহু কবি এই কৃত্রিমভাষা ব্রজবুলিকে পদরচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। পূর্ব-ভারতের শীর্ষস্থানীয় এই কবির ভাবধারার সুযোগ্য অনুসৃতি চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনায় লক্ষ করা যায়। তাই বাংলায় বহু পদকারের রচনায় বিদ্যাপতির রচনার প্রভাব থাকলেও তাঁকেই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ব্রজবুলি ভাষা প্রসঙ্গে :

অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষায় বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ মিশিয়ে একটি বিশেষ ভাষা পাওয়া গিয়েছিল। মিথিলার কবি উমাপতি ওঝার গীতিনাট্য 'পারিজাতহরণে' এর প্রথম লিখিত নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিদ্যাপতিকেই মনে করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'ব্রজবুলি' আর 'ব্রজভাষা' এক নয়। ব্রজভাষা মথুরার ভাষা। আর ব্রজবুলি হল একটি মিশ্র, কৃত্রিম ভাষা। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মিথিলায়, বাংলায়, ওড়িশায় এবং আসামে ব্রজবুলির চর্চা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তারা ক্রমাগত এ ভাষায় পদরচনা করেছেন। এই ভাষার ধ্বনিমাধুর্য এবং পদাবলির প্রতি বাঙালির চির-আকর্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার দিকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' লেখেন।

নমুনা : 'হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।' (বিদ্যাপতি)

জ্ঞানদাস :

বৈষ্ণব পদাবলি রচয়িতা জ্ঞানদাস ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার কাঁদড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি চণ্ডীদাসের কাব্যধারার উত্তরসূরি এই কবি অনুরাগ ও 'আক্ষেপানুরাগ'-এর পদে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর রচিত পাঁচশোর বেশি পদে ভাবের গভীরতা, ঘটনা সংস্থান সৃষ্টির মৌলিকতা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই যথাযথ অলংকরণ ও

মণ্ডনকলাও ঈর্ষণীয়। চৈতন্যোত্তর যুগের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর বাংলায় রচিত পদগুলিতে পাওয়া যায়। বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা পর্যায়ের বহু পদ তিনি ব্রজবুলি ভাষাতে রচনা করলেও তা বাংলায় রচিত পদগুলির মতো রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। রচিত পদগুলির লিরিকধার্মিতায় অর্থাৎ গভীর অনুভূতির আকুতিকে সংহত ও তীব্র আকারে প্রকাশ করার বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতিকে তিনি কাব্যভাষায় যথার্থ লিরিকধর্মী করে তুলেছেন যা সকলের কাছেই পরম আস্বাদ্য হয়েছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ :

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ (জন্ম আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, দেহাবসান সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে) সাধক এবং ভক্ত রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন এবং আপন কবিত্ব শক্তির গুণে খেতুরীর মহোৎসবে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সুবৃহৎ বৈষ্ণব সংকলনগ্রন্থ 'পদকল্পতরু'তে তাঁর অজস্র পদ সংকলিত হয়েছে। পদ রচনা ছাড়াও তিনি 'সঙ্গীতমাধব' নামে একটি নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। রূপদক্ষ শিল্পী গোবিন্দদাস কবিরাজ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হয়েছেন। ব্রজবুলিতে পদরচনার পোরিপাট্যে, অলংকারের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, ছন্দকুশলতায়, চিত্রসৃষ্টি ও সংগীতময়তায়, ভাষার মাধুর্য ও রহস্যময়তায়, তিনি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন। শ্রীরাধার সখী বা মঞ্জরীভাবে অনুগত সাধনা শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য, তার অনুসরণ গোবিন্দদাসের পদে লক্ষ করা যায়। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের 'অষ্টকালীয় লীলা' বর্ণনার পরিকল্পনার পথিকৃৎ রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বৈষ্ণব পদাবলির বিবিধ রসপর্যায়ে—(গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার, রসোদ্গার, প্রার্থনা প্রভৃতি) তাঁর সৃষ্টির অনন্য স্বাক্ষর রয়েছে।

বলরাম দাস :

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পরেই বলরামদাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নামে একাধিক পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গেলেও, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম হলেন নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস, তিনি ষোড়শ শতকের শেষদিকে কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে আবির্ভূত হন। বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থে ইনি 'সংগীতকারক', 'সংগীতপ্রবীণ' ইত্যাদি নামে পরিচায়িত হয়েছেন। 'পদকল্পতরু'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'ভক্তিরত্নাকর' অনুসারে তাঁর উপাধি 'কবিপতি'। সহজ, সরল ভাষায় ব্রজবুলি ও বাংলায় রসোদ্গার, রূপানুরাগ, বাৎসল্যরসের পদ রচনায় তিনি অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণ ও মা যশোদার স্নেহব্যাকুল পদগুলিতে তাঁর স্বত:স্ফূর্ত হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে মুসলিম কবিরাও গৌরচন্দ্রিকা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। চৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিরা গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন, বিরহ, খণ্ডিতা, দানলীলা, হোলিলীলা প্রভৃতি বিষয়ে পদ রচনা করেন। এছাড়াও সুফি সাধকেরা তাঁদের রচনায় জীবাত্মা-পরমাত্মার কথা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অবতারণা করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বাংলার কয়েকজন মুসলিম কবি হলেন, অয়াহিদ, সৈয়দ আকবর আলি, সৈয়দ আলাওল, উন্মর আলি, কবীর শেখ, গরীব খাঁ, লালন ফকির, লাল মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ।

বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব :

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রি:-১৫৩৩ খ্রি:) বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ না করে তিনি তাঁর 'ভক্তিধর্ম' প্রচার করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তা চিরন্তন, সর্বজনীন আদর্শের অনুগত। তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং নাম সংকীর্তনের উপর। আত্মমর্যাদাহীন বাংলার মানুষ তাঁর দীক্ষায় আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। তিনিই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, সব মানুষই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। সেই বিশ্বাস থেকেই ধর্মে, দার্শনিক চিন্তায়, সাহিত্যে, সংগীতে বাঙালি তার উৎকর্ষের পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

বৈষ্ণব পদাবলি ও বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরই প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম এক দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালের পদাবলি সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। তাঁকে অবলম্বন করেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর পুণ্য জীবনকে নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় প্রচুর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাঁর পরবর্তীকালের বৈষ্ণবসাহিত্য তো বটেই, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং লোকসাহিত্যও তাঁর ভাবাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। শাক্ত পদাবলি সাহিত্যের ও বাউলগানের ভক্তিধারাও বহুলাংশে চৈতন্য প্রভাবিত।

হিংসা-দ্বেষ-কলুষতাময় ক্লেদাক্ত সমাজে প্রেমের আদর্শের প্রভাবে মানুষ বেঁচে থাকার নতুন পথের সন্ধান খুঁজে নিয়েছিল। নানা বৈষম্য, বিভেদ, অনাচার, সংস্কার, মোহ ঘুচিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বলা যায়, চৈতন্যদেব বাংলায় এক নবজাগরণের অগ্রপথিক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখেছেন—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'।

মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলি ও জীবনীসাহিত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর লীলাকথারই প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলির 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ'গুলিতে। তাঁর প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ রচনার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি। তাঁর জীবন-নির্ভর কাব্যগুলির আগে বাংলায় কোনো জীবনীকাব্য ছিল না। সেক্ষেত্রে, জীবনীসাহিত্য রচনার উৎস হিসেবে তিনি রয়েছেন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত আচার্য, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী, চৈতন্য-অনুচর নিত্যানন্দ প্রমুখের জীবনীকাব্য রচিত হয়, যেগুলিতে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। চৈতন্য-পরবর্তী মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তাঁর পুণ্য জীবনাদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে। মুদ্রিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি পাঠের সুবাদে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও বহু লেখক শ্রীচৈতন্যকে বিষয় করে কাব্য-কাহিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ' কাব্য, শিশিরকুমার ঘোষের গদ্যজীবনীগ্রন্থ 'অমিয়-নিমাই চরিত', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীচৈতন্যলীলা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থে, যাত্রাগানে, পাঁচালিতে, কবিগানে তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সনাতন, রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী, তাঁরই নির্দেশে, যা পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সমাজকে পথ দেখিয়েছে। তাঁর প্রচারিত মানবপ্রেমের সুউচ্চ আদর্শ, 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ' (হরিভক্ত চণ্ডাল হরিভক্তিহীন দ্বিজের থেকে শ্রেষ্ঠ)র মতো উদ্ধৃতি, আচারসর্বস্ব, জাত-পাতের কলুষতায় দীর্ণ জাতিকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে।

সারা ভারতে কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব, নয়সি, মেহ্‌টা, মীরাবাঈ, শঙ্করদেব প্রমুখ বহু সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সামাজিক অনাচার এবং শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে উদার মানবধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বাংলার সামাজিক জীবনে সেই সুমহান আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক।

প্রাক-চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর পদাবলির তুলনা :

কালের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলির ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলি। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ প্রধানত পঞ্চদশ শতকে এবং তার বিস্তার প্রায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের নানান উত্থান পতনের মতোই বৈষ্ণব সাহিত্য এবং ইতিহাসও বিবর্তনের পথরেখা ধরে এগিয়েছে। দশম-দ্বাদশ শতকে বিকশিত পুরাণ-নির্ভর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা যায়। আবার, চৈতন্য আবির্ভাবের পর গৌরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম যে নতুনত্ব লাভ করে, তার আবেশে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলি বিচিত্রমুখী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই, কালের পার্থক্যই শুধু নয়, প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলি সাহিত্যের মধ্যে আদর্শগত ও মর্জিগত পার্থক্যও লক্ষণীয়।

১. চৈতন্যপূর্ব যুগে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের রচনায় বিশেষ সাম্প্রদায়িক আদর্শগত প্রেরণা ছিল না। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের রচনায় চৈতন্যপ্রভাবে বিশেষ ধর্মকেন্দ্রিক পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণলীলা রূপায়িত ও আস্বাদিত হতে শুরু করে।

২. চৈতন্য বিষয়ক পদাবলি ‘গৌরচন্দ্রিকা’ ও ‘গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ’ চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতেই দৃষ্টিগোচর হল।

৩. বৈষ্ণবধর্ম সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা ছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির পরিপূর্ণ রসাস্বাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের পদাবলিতে ভক্ত কবির ‘মুক্তিবাঞ্ছা’ই যেখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেখানে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতে ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি এবং গোপীদের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার সুযোগলাভ প্রার্থনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। কবিরা আর লীলাশুক নন, গোপীভাবে ভাবিত।

৫. প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বাসুদেব প্রায় অভিন্ন ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে উৎস হিসেবে শ্রীমদ্ভাগত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, কৃষ্ণকথামৃত, ব্রহ্মসংহিতা আদৃত ও স্বীকৃত হয়েছিল। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মে যে ভক্তিবাদ তা ‘বৈধী ভক্তি—বিধিবিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশে যে ভক্তির জাগরণ তাই বৈধীভক্তি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ভক্তিবাদ হল ‘রাগানুগা’ ভক্তিবাদ। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে কৃষ্ণের মাধুর্যভাবের সঙ্গে যে ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে সেই ঐশ্বর্যভাব তিরোহিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থে পরিণত হল।

৬. প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে রাধা ও চন্দ্রাবলী ছিলেন অভিন্না। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে রাধা নায়িকা এবং চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা হয়ে উঠলেন। রাধা এখানে শুধু নায়িকা নন,—তিনি ‘মহাভাবস্বরূপিনী’।

৭. চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতে চৈতন্যের ভগবদ্‌সত্তার রূপায়ণ লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল।

চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিধর্মের প্রচার পরবর্তী সাহিত্যের ধারায় ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে সাপ, বাঘ, কুমির প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে মানুষ ভয় করে এসেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য পূজার্চনাও করেছে। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কথা ও কাহিনি তথা মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা, আসাম, বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের কবিরা একই কাহিনিকে অবলম্বন করে গতানুগতিক কাব্য রচনা করলেও চৈতন্য পরবর্তী যুগের কাব্যকাহিনিতে ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রূপগতভাবে না হলেও, শক্তিকাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ভাবগত পরিবর্তন এনেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী চৈতন্যোত্তর কাব্যে তাদের নির্দয়, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপ হারিয়ে কোমলহৃদয়া হয়ে উঠেছেন, যা বৈষ্ণবীয় সহিষ্ণুতারই আদর্শের প্রতিফলন। কাব্যে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির দিকটিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, যা চৈতন্যদেবের সমন্বয়ী ও সহনশীল মনোভাবেরই সম্প্রসারণ। এমনকি, ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে 'বিষ্ণুপদ' লক্ষ করা যায়। অনেকের মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে পরবর্তীকালে 'চৈতন্য বন্দনা'ও দেখা যায়। এছাড়া, বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাবেই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথাগত রূপ ভেঙে ক্রমশ শাক্ত পদ গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শাক্ত পদাবলির বাৎসল্যরসের পদে, আগমনী বিজয়া গানে বৈষ্ণব পদাবলির কোমলতা ও স্নিগ্ধতার ছায়া এসে পড়েছে। ভাগবত অনুবাদের ধারাতেও প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপই প্রস্ফুটিত, চৈতন্য সমকালে বা চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সখাসখীদের নাম থেকে শুরু করে নানা ঘটনার সন্নিবেশে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-বীরত্বের পাশাপাশি মধুর রূপটিও ফুটে উঠেছে।

চৈতন্যজীবনী সাহিত্য :

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের আদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী, পরে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত রচিত ৭৮ সর্গে বিভক্ত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' (মুরারি গুপ্তের কড়চা)। চৈতন্য-অনুচর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর) রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' সংস্কৃতে রচিত উল্লেখযোগ্য জীবনী মহাকাব্য। প্রাচীন নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের আদর্শে কবিকর্ণপুর রচিত দশ অঙ্কে সমাপ্ত নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-এ সমগ্র চৈতন্য জীবনী বর্ণিত হয়েছে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় চৈতন্য-পরিকর ও ভক্ত শিষ্যদের পরিচয় রয়েছে। কাশীধাম নিবাসী চৈতন্য-ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' একটি উল্লেখযোগ্য চৈতন্যস্তোত্রকাব্য। এছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মহাপ্রভুকে অবলম্বন করে অনেক স্তবস্তোত্র লেখেন। শ্রীচৈতন্য জীবনকাহিনি নির্ভর সংস্কৃত জীবনী-কাব্য-নাটকগুলির অধিকাংশই তাঁর পার্ষদ পরিকরদের রচিত হওয়ায় এগুলির তথ্যগত মূল্য অপরিসীম। এই সংস্কৃত রচনাগুলির মধ্য দিয়ে অবাঙালি সমাজেও চৈতন্য মহিমা ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের 'কড়চা', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য রচনার জন্য 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' অভিধায় সম্মানিত হয়েছেন। তিনি চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়নীর পুত্র। তাঁরই নির্দেশে কবি কাব্যনাম 'চৈতন্যমঙ্গল' বদলে শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখেন, কেননা প্রায় সমসময়ে লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। অন্য মতানুসারে, চৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা বিন্যাসের অনুসরণ লক্ষ করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কাব্যের এমন নামকরণ করেন। তিনটি খণ্ডে, একান্নটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বিপুলায়তন জীবনী কাব্যে চৈতন্য জীবনের

বৈষ্ণব আচার্যদের চরিত সাহিত্য :

চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনি অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে চরিতসাহিত্য রচনার যে ধারা গড়ে ওঠে, তারই অনুসৃতিতে মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁর শিষ্য, বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনকাহিনি নিয়েও জীবনী লেখা হয়েছিল। এ সকল চরিতাখ্যান থেকে তাঁদের জীবনে ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিতির পাশাপাশি বৈষ্ণব পদকর্তাদের সময়কাল, বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, চৈতন্যলীলা কাহিনি—প্রভৃতিও জানা যায়।

ঈশান নাগর—অদ্বৈত প্রকাশ। শ্যামদাস আচার্য—অদ্বৈত মঙ্গল। হরিচরণ দাস—অদ্বৈত মঙ্গল। নরহরি দাস—অদ্বৈত বিলাস। বিষ্ণুদাস আচার্য—সীতাগুণ কদম্ব। লোকনাথ দাস—সীতাচরিত্র। নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস। যদুনন্দন দাস—কর্ণানন্দ। রাজবল্লভ—বংশীবিলাস / মুরলীবিলাস। গুরুচরণ দাস—প্রেমামৃত। গোপীবল্লভ দাস—রসিকমঙ্গল। মনোহরদাস—অনুরাগবল্লী। নরহরি চক্রবর্তী—ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবপদকর্তা

প্রাক্-চৈতন্যযুগ : জয়দেব, চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা), চণ্ডীদাস (পদাবলি সাহিত্য রচয়িতা) বিদ্যাপতি, গুণরাজ খান প্রমুখ

চৈতন্য সমসাময়িক যুগ : রায় রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, যদুনন্দন, বংশীদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, মাধাব দাস, যদু কবিচন্দ্র, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন প্রমুখ

চৈতন্যোত্তর যুগ : কবিরঞ্জন, রায়শেখর (কবিশেখর), জ্ঞানদাস, লোচনদাস, গোকুলানন্দ, উদ্ধবদাস, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ দাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম দাস, জগদানন্দ, মনোহর দাস, রাধামোহন ঠাকুর, যাদবেন্দ্র, দেবকীনন্দন, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, গদাধর দাস, কবিবল্লভ, নসির মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা, কুমুদানন্দ, নৃসিংহ কবিরাজ, প্রসাদ দাস, দিব্যসিংহ, বলরাম কবিরাজ, যদুনন্দন দাস, গৌরদাস, গোপাল দাস, মনোহর দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীনবন্ধু দাস, কমলাকান্ত দাস, যদুনাথ দাস, কানাই খুটিয়া, নিমানন্দ দাস, নটবর দাস, গৌরসুন্দর দাস, বৈষ্ণব দাস, উদ্ধব দাস, কানুরাম দাস, অনন্ত দাস, বৃন্দাবন দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, বীর হাম্বির, বসন্ত রায়, বল্লভ দাস প্রমুখ।

বৈষ্ণব গ্রন্থ

দুর্লভসার—লোচন দাস—ষোড়শ শতাব্দী, রসকদম্ব—কবিবল্লভ—ষোড়শ শতাব্দী, চতুষ্কাণ্ড পরিমিতি—দ্বিজ ঘনশ্যাম—সপ্তদশ শতাব্দী, গোবিন্দমঙ্গল—কবিচন্দ্র—সপ্তদশ শতাব্দী, হরিবংশ—ভবানন্দ, সপ্তদশ শতাব্দী, কৃষ্ণমঙ্গল—ভবানীদাস ঘোষ—সপ্তদশ শতাব্দী, গোবিন্দবিজয়—অভিরাম দত্ত—সপ্তদশ শতাব্দী, প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস—সপ্তদশ শতাব্দী।

- **কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও গোস্বামীগণ :** শ্রীচৈতন্য, সনাতন গোস্বামী। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বৈষ্ণব সঙ্কলন ও অন্যান্য

সপ্তদশ শতাব্দী : রামগোপাল দাস—রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী, নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস, নন্দকিশোর দাস—রসপুষ্পকলিকা, পীতাম্বর—রসমঞ্জরী, মনোহর দাস—দিনমণি চন্দ্রোদয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, নরহরি চক্রবর্তী—গীতচন্দ্রোদয়, রাধামোহন ঠাকুর—পদামৃত সমুদ্র, দীনবন্ধু দাস—সঙ্কীর্তনামৃত, রাধামুকুন্দ দাস—মুকুন্দানন্দ, কমলাকান্ত—পদরত্নাকর, গোকুলানন্দ সেন—পদকল্পতরু।

চৈতন্যজীবনীকাব্য (বাংলা)

বৃন্দাবনদাস—চৈতন্যভাগবত (ষোড়শ শতাব্দী), লোচন দাস—চৈতন্যমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ষোড়শ শতাব্দী), জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), চূড়ামণি দাস—গৌরাঙ্গবিজয় (ষোড়শ শতাব্দী), গোবিন্দ দাসের কড়চা (অপ্রামানিক), প্রেমদাস—চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী (অষ্টাদশ শতাব্দী) ভগীরথ বন্ধু—চৈতন্য সংহিতা, (সংস্কৃত)—মুরারি গুপ্ত—'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত', স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস—চৈতন্য চরিতামৃত, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

শেষ পর্যায়ের কথা বিশদে কবি লেখেননি। নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতপ্রভুর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, মুরারিগুপ্তের কড়চার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ভাগবতকে অনুসরণ করে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের বাল্য ও কৈশোরলীলার প্রাঞ্জল বর্ণনার পাশাপাশি চৈতন্য ধর্মসম্প্রদায়, চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তির কথা সুললিত ভঙ্গিমায় পরিবেশিত হয়েছে। তাই শুধু কাব্য হিসেবে নয়, ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও চৈতন্যভাগবতের মূল্য অপরিসীম।

শ্রীখণ্ড গ্রামের বিখ্যাত চৈতন্য অনুচর নরহরি সরকারের সুযোগ্য শিষ্য লোচন দাস ১৫৫০-৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত—'সূত্রখণ্ড', 'আদিখণ্ড', 'মধ্যখণ্ড' এবং 'শেষখণ্ড'। এটি গেয় কাব্য, অনেকটা মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত এই কাব্যে শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানান কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রামাণিকতার বিষয়ে সংশয় রয়েছে। তাঁর কাব্যেও মুরারিগুপ্তের কড়চার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া লোকশ্রুতিকে তিনি কাব্যনির্মাণে বড়ো ভূমিকা দিয়েছেন।

বর্ধমান নিবাসী, চৈতন্যভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে চৈতন্যজীবন কথার পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশের পরিচয় মেলে। মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির অনুসারী, জনসাধারণের জন্য, গানের রীতিতে রচিত এই কাব্যটি নয়টি খন্ডে বিভক্ত। জনতার মনোরঞ্জনের জন্য কবি বৈষ্ণব কাব্য রচনা করতে গিয়ে আদ্যাশক্তির বর্ণনা বা কালীমূর্তির বন্দনা করেছেন। তাঁর কাব্যে নবদ্বীপের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ ইতিহাস সমর্থিত।

বর্ধমান নিবাসী বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে যান এবং বৈষ্ণব আচার্যদের সান্নিধ্যে ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি বৃন্দাবনের আচার্যদের অনুরোধে অশক্ত শরীরে চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যখণ্ড বিস্তারিত আকারে বর্ণনার সংকল্প করেন। বৃন্দাবনদাসের রচনায় সংক্ষেপিত বা অনালোকিত চৈতন্যজীবনের নানা অধ্যায়কেই তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তিনটি খণ্ডে (আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড), বাষট্টিটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই কাব্যে বৈষ্ণবদর্শন, ভক্তিশাস্ত্র ও চৈতন্যতত্ত্বের নিগূঢ় বর্ণনা রয়েছে। কাব্যে দর্শনের গভীর আলোচনার সুবাদেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিনয়, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, মননের সঙ্গে হৃদয়ানুরাগ মিশে গেছে।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমভারত ভ্রমণের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র (প্রকাশকাল—১৮৯৫) ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত। এই গোবিন্দদাসের পরিচয় নিয়ে সংশয় থাকলেও তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি 'ভুবনমঙ্গল' নামেও পরিচিত। কাব্যের শুধু আদিখণ্ডটিই লভ্য, তাও তথ্যগত অসঙ্গতিপূর্ণ। জীবনীসাহিত্য রচনার ধারা পরবর্তীকালেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের অনুচর পরিকরদের জীবনীতে, বৈষ্ণব আচার্যের জীবনীতেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

আরাকান রাজসভার কাব্যচর্চা :

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে চট্টগ্রামের রোসাঙ্গ রাজসভার বিপুল অবদান রয়েছে। রোসাঙ্গের রাজবংশ মগ এবং তাঁদের মাতৃভাষা আরাকান। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত হয়, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় হোসেন শাহ যখন চট্টগ্রাম জয় করেন, তখন আরও গভীর হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

চৈতন্যপ্রভাব ও সুফি পিরদের প্রভাবে এই অঞ্চলে কাব্য-সঙ্গীত চর্চা, অনুশীলন চলতে থাকে। চট্টগ্রাম ও নিম্নবঙ্গ অঞ্চলের শিক্ষিত মুসলিমেরা রাজসভায় উপস্থিত হলে তাঁদেরই আগ্রহে গৌড় দরবারের অনুকরণে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রপাত হয়। আরাকানের সাহায্যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত আরব্য উপন্যাস জাতীয় গল্প, রূপকথা, লৌকিক কাহিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়। এদের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গৃহীত হয়েছিল। এসময়ে বহু লোকগীতি, প্রণয়কাব্যে চৈতন্য প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ার পাশাপাশি নব্য স্মার্ত চেতনার প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। এ সময়ে বহু মুসলিম কবি আরবি-ফারসি লোককথার সাহায্যে সাধারণ মানুষের কথা সাহিত্যে নিয়ে এলেন লোকগাথামূলক প্রণয়কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। আরাকান রাজসভায় মুসলিম কবিদের এসব রচনাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) অনুবাদ সাহিত্য—আরবি-ফারসি লোককথা কাব্য, গল্প অবলম্বনে রচিত (২) রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ বা পদাবলি সাহিত্য, (৩) ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও তান্ত্রিক যোগ বিষয়ক নিবন্ধ (৪) বিদ্যাসুন্দর কাব্য। মূলত অনুবাদ গ্রন্থ হলেও সাহিত্যে এদের ভূমিকা কম নয়। এই কাব্যবিভাগগুলির অন্যতম প্রধান কবিরা হলেন যথাক্রমে দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, সাবিরিদ খান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যতা দাবী করলেও সেই শতাব্দীর শেষদিকে আরাকানের রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাঙালি মুসলিমেরা ক্ষমতাচ্যুত হলে বাংলা সংস্কৃতির পূর্ব সমাদর আর থাকেনি। তবু চট্টগ্রামের শিক্ষিত মুসলিমেরা সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দেননি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়, ভুরশিট-মান্দারণ প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি মুসলিমেরা এক বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সিলেটের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে সুলতানদের অধিকার বিস্তৃত হলে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে বাঙালি মুসলিমদের সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃজিত হয়। আরাকান ও চট্টগ্রামে মুসলিম অধিকার অবলুপ্ত হওয়ার পরেও সিলেট অঞ্চল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইসলামি সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবি আমল শুরু হওয়ার আগে থেকেই বাঙালি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রসার হতে থাকে। সে সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য ছিল ধর্ম, ঘর, গৃহস্থালির কাজে, সমাজে ব্যবহৃত ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক প্রচলন তখনও ছিল যা আজও বর্তমান। ইংরেজ আমল শুরু হলে কলকাতার মজদুর মুসলিমদের পাঠ্যগ্রন্থে যখন আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দির মিশ্রণ নিবিড় হয়ে উঠলে 'ইসলামি বাংলা' তৈরি হল।

ইসলামি বাংলার সাহিত্য---বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে---জঙ্গনামা---হেয়াৎ মামুদ, নসরুল্লা খান, আরিফ, গরিবুল্লা। ● রসুলবিজয়—সাবিরিদ খান, জৈনুদ্দিন, শেখ চান্দ। ● পদাবলি—সৈয়দ মুর্তজা, আলীরাজা। ● গাজীমঙ্গল—আবদুল গফুর, সৈয়দ হালু মিঞা, জৈনুদ্দীন, ফয়জুল্লা। ● পিরগাথা বা সত্যনারায়ণ পাঁচালি—আরিফ, ফৈজুল্লা। ● রোমান্টিক কাব্য-কবিতা—মহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, শাহ মহম্মদ সগীর, সাকের মামুদ, সেরাদোতুল্লা, আবদুল রহমান, দৌলত উজীর। ● বিবিধ—শেখ রাজ, সেখ সাদী, সৈয়দ মর্তুজা।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও শাক্ত পদাবলি :

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের পর (ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু) বাংলার নবাবি রাজত্বেও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শিথিলতার প্রভাব অলক্ষণীয় থাকল না। নবাবদের বিলাসব্যসন মত্ততা, ষড়যন্ত্র, ভূস্বামীদের শোষণ, বর্গির হাঙ্গামা, অত্যাচার, পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ—বাঙালিদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে মানুষ এমন এক দেবতার কল্পনা করেছিল, যিনি মুহূর্তে মানুষকে পরিপূর্ণতায় ভাস্বর করে দিতে পারেন, আবার মুহূর্তে জীর্ণ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে নতুন প্রাণের সম্ভাবনা গড়ে দিতে পারেন। বাঙালির দুঃখ চিত্রের কথা ও দুঃখ মুক্তির সুর শাক্ত গানগুলিতে পরম আকুলতায় ফুটে উঠেছে।

বাঙালির মাতৃভাবানুরাগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে এই গানগুলিতে। পল্লীনির্ভর বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গভীর সুর এই গানগুলিতে ছত্রে ছত্রে মর্মরিত হয়ে উঠেছে। এই শাক্ত-সঙ্গীতের পথিকৃৎ সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, যিনি 'কবিরঞ্জন' নামে প্রসিদ্ধ। খ্যাতনামা এই শক্তিসাধক, কবি ও গায়কের জন্ম আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে। পিতা রামরাম সেন। খুব কম বয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হয়। অবসর পেলেই শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করে খাতায় লিখে রাখতেন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর গানগুলি 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' নামে পরিচিত এবং সঙ্গীতগুলির সুর বা গীতিভঙ্গি বাংলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কালীকীর্তন' নামে তাঁর একটি ছোটো বইও রয়েছে।

তাঁর আগে এমন ধরনের মাতৃগীতি বাংলা সাহিত্যে ছিল না। সহজ সরল ভাষায় ভক্ত প্রাণের আকুতি গানগুলির সম্পদ। তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকথা গানগুলিতে থাকলেও তা দুর্বোধ্য ও নীরস হয়ে পড়েনি। রামপ্রসাদের অনুকরণে বহু কবি শাক্তসঙ্গীত রচনা করেছেন। শাক্ত গানের বিভিন্ন পর্যায়—যেমন বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, মাতৃপূজা, সাধন শক্তি, নাম-মহিমা ইত্যাদি। শাক্ত পদাবলির কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, এন্টনী সাহেব, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাম বসু, রূপচাঁদ পক্ষী, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ।

খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীতকার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনুমানিক ১৭৭২-১৮২১ খ্রি:) তাঁর গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতাসমৃদ্ধ গানের জন্য বাংলা শাক্তসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে', 'তুমি যে আমার নয়নের নয়ন', 'মজিল মোর মন ভ্রমরা' ইত্যাদি। 'সাধকরঞ্জন' নামে তাঁর একটি বিখ্যাত তান্ত্রিক কবিতা গ্রন্থ রয়েছে।

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল গান, মুর্শিদি গান

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত 'বাতুল' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'উন্মাদ' বা 'বায়ুগ্রস্ত'। ঈশ্বরের প্রেমে উন্মাদ শাস্ত্রভারমুক্ত বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের শুরুতে আর তার বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে এবং তারও পরে।

'বাউল' বলতে কখনো বিশেষ এক শ্রেণির অধ্যাত্মমূলক পল্লিগীতিকে বোঝায়, আবার কখনো বা এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়কে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী ফকিরের রূপে এই বাউলদের দেখা যায়। বাউলগান এই ধর্মসম্প্রদায়েরই গান, যা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই গান কখনো স্বরচিত কখনো বা ভক্ত পরম্পরায় প্রাপ্ত। অত্যন্ত প্রাচীন সাধনাধারায় এই সাধকেরা তাঁদের যাবতীয় সাধনপদ্ধতি রূপকের আড়ালে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যে গান নানা বাদ্যযন্ত্র যেমন-একতারা, খঞ্জনি, ডুগি, খমক ইত্যাদি সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। তালবদ্ধ এবং ছন্দোপ্রধান গানের সঙ্গে থাকে নৃত্য, গায়কের পায়ে বাজে ঘুঙুর। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রচলিত ধর্মসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত বাউলেরা স্বভাবতই প্রতিমাপূজা, ব্রত-নিয়ম, উপবাস, তীর্থযাত্রায় বিশ্বাস করেন না। ধর্মসাধনায় এঁরা উল্টা সাধনের পক্ষপাতী; যোগসাধনার ক্ষেত্রে নি:শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে উল্টো পথে প্রেরণ তাঁদের অবশ্য আচরণীয়, প্রধান কৃত্য। অন্য অনেক গুহ্যসাধন পদ্ধতির মতো বাউলগোষ্ঠীর মধ্যেও গুরু বা মুর্শিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর নির্দেশেই শিষ্য প্রকৃত সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। তিনিই অনেক সময় ভগবানের সঙ্গে তুলিত হয়েছেন। 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড' তত্ত্বে বিশ্বাসী বাউলের দৃষ্টিতে মানুষের দেহেই পরমদেবতার বাস। এই পরমদেবতা বা 'মনের মানুষ'ই তাঁদের সাধ্যবস্তু, অন্যত্র যাঁর অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। 'মনের মানুষ' অনন্ত, পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত প্রেমেরও আধার। অসীমকে সীমার মধ্যে অনুভব করিবার প্রয়াস এবং সীমাবদ্ধ জীবনে অসীমের ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শলাভের ফলে বিস্ময়—বাউলদের গানে এই ভাবটি বারবার প্রকাশ পাইয়াছে।' (ভারতকোষ, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ) 'মনের মানুষ'কে এঁরা 'সাঁই', 'দীন দরদী সাঁই', 'অচিন পাখি', 'গরজী' ইত্যাদি অভিধাতেও অভিহিত করেছেন।

বাউলগানে গভীর ঈশ্বর অনুভূতির কথা রয়েছে, রয়েছে ভগবানের প্রতি অপার নির্ভরশীলতার কথা। লোকশিক্ষামূলক এই গানগুলি বাংলাদেশে সমাজ-বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা দূর করতে বহুলাংশে সক্ষম হয়েছে। বাউলগানের প্রসিদ্ধ সাধক শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন লালন শাহ ফকির (যিনি আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গান রচনা করেছিলেন), পদ্মলোচন গোঁসাই, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্জশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, এরফান্ শাহ্, পাগলা কানাই প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউলগানের গভীর সংযোগ ছিল। আধুনিককালে তিনিই প্রথম বাউল গান সংগ্রহ করেন। বাউল সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ধারার প্রবর্তক ছিলেন জগমোহন, যাঁর অনুগামীরা

'জগমোহনী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। গুরু আউলচাঁদ একতারা বাজিয়ে বাউল গানের প্রচলন করেন। মূলত তাঁর সময় থেকেই গুরুপরম্পরাবদ্ধ বাউল সাধনার সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

মুসলিম লোকসমাজে বাউলের অনুরূপ সহজ সাধনার যে পন্থা, তাকেই মুর্শিদি বা মারিফতি ধারা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাউল সাধনার মতো এখানেও শাস্ত্রাচার বর্জন করা হয়েছে। ইসলামি সুফি-ভজন-পদ্ধতি দ্বারা মুর্শিদি মারিফতিকে প্রভাবিত হতে দেখা যায়। 'মারিফত' শব্দের অর্থ 'পন্থা'। তাঁদের সাধনাও গুরুমুখী। তাঁদের গানে গুরুগম্য সাধনপন্থার কথাই অনুভববেদ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে।

নাথ সাহিত্য :

মঙ্গলকাব্য ছাড়া 'নাথ সাহিত্য' নামে পরিচিত আরেক শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান শিব-উপাসক এক যোগী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ধর্মই হল নাথধর্ম। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কালক্রমে স্তিমিত হয়ে এলে তার সঙ্গে শৈবধর্মের মিশ্রণের ফলেই এই নাথধর্মের উৎপত্তি। নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের যোগ-মাহাত্ম্যই নাথ সাহিত্যের বিষয়, কীভাবে যোগের শক্তিতে দুঃখ বিপদ অতিক্রম করা যায়, জয় করা যায় মৃত্যুকে পর্যন্ত—নাথসাহিত্যে সে কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই নাথসাহিত্যের দুটি ভাগ। সেগুলি হল (১) শিষ্য গোরক্ষনাথ কীভাবে গুরু মীননাথকে উদ্ধার করলেন সেই কাহিনি অর্থাৎ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ মীননাথকে যোগী করে তোলার কাহিনি আর (২) রানি ময়নামতী আর তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনি। যে আলাদা ছড়া-পাঁচালির আকারে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনি রয়েছে, তার নাম 'গোরক্ষবিজয় বা 'মীন-চেতন; আর, যে কাহিনিতে রানি ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা 'ময়নামতীর গান' বা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে নানা প্রক্ষেপের মধ্য দিয়ে এসব কাহিনির মূল রূপটি বর্তমানে বহুল-পরিবর্তিত, এমনকি, এর বহু পুঁথিতে চৈতন্য প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই নাথসাহিত্য—'গোরক্ষবিজয়' আর 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রাম্য কবিদের রচনা। যে কারণে এতে না আছে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর, না আছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রভাব। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষা-রীতিই নাথসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তবুও এতে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতার সঙ্গে কবিত্বের স্ফূরণও লক্ষ করা যায়। করুণ রসাত্মক গোপীচন্দ্রে গানে প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রের সহজ রূপায়ণ ঘটেছে, সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় রয়েছে, গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রকৃতির বিবরণও এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গানগুলিতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব নানাভাবে এসেছে। এসেছে অতিপ্রাকৃত তথা অলৌকিকতার স্পর্শ। বাংলার বাইরে গানগুলির প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলিকে মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া—প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদও করা হয়েছিল। বহু কবি 'গোরক্ষবিজয়' এবং 'গোপীচন্দ্রের গান' রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের আগে লেখা মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনির কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে রয়েছেন ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লা প্রমুখ।

ময়নামতীর গানের প্রাপ্ত পুথির মধ্যে কোনোটি সপ্তদশ শতকের আগে রচিত নয়। এ কাহিনির উল্লেখযোগ্য কবি হলেন-দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মামুদ প্রমুখ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা :

ময়মনসিংহের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)-র প্রচেষ্টায় সংগৃহীত ও 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' দেখে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৮৬-১৯৩৯) 'ময়মনসিংহ গীতিকা'

সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এরপর আরো কয়েকটি খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। সমগ্র গীতিকা সংকলনই 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রচলিত। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল আগে ময়মনসিংহে উদ্ভূত এর কাহিনিগুলির ভাষারও বিবর্তন ঘটেছে, তাই সুনিশ্চিত করে এর উদ্ভবকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। কাহিনিগুলিতে বৈচিত্র্যময়, সরল, স্বত:স্ফূর্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ, সম্প্রীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ গ্রামজীবনের অনবদ্য ছবি ধরা পরেছে। আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতার স্পর্শরহিত সমাজজীবনের এই ছবি মূলত ধর্মনির্ভর মধ্যযুগীয় কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র। গীতিকবিতার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি পূর্ববঙ্গ গীতিকায় লক্ষ করা যায়। দ্বিজ কানাই, নয়নচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ ঈশান, রঘুসুত, চন্দ্রাবতী, ফকির ফৈজু, মনসুর বয়াতি প্রমুখের রচনায় গীতিকা-সাহিত্য উজ্জ্বল। কবিরা তাঁদের রচনায় তৎকালীন সমাজ ইতিহাসের যেমন প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, পুরাণ-দর্শন-ধর্মতত্ত্বের অনুবর্তনও ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ময়মনসিংহ গীতিকা বাঙ্গালার পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত: উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা।' নানা ইতিকথা অবলম্বনে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কথা কবিত্বময় ও সুসংহত আকারে গীতিকাগুলিতে উৎসারিত হয়েছে। এর বিভিন্ন পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—আঁধা বধুঁ', 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কমলা', 'কঙ্ক ও লীলা' 'দস্যু কেনারাম' প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ধর্মসাধনা তথা ঈশ্বর-উপাসনাকে ভিত্তি করে। তাই সাধন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের প্রতিফলন সাহিত্যে অনিবার্যভাবেই এসেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে তাতে বাংলাদেশে ধর্মসাধনার বহু বিচিত্র প্রকাশকে অনায়াসে সুচিহ্নিত করা যায়। যেমন— তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, নাথধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতি। এছাড়াও অসংখ্য লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভবও সে সময়ে ঘটেছে। এইসব ধর্মসাধন-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুগের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চর্যাপদ, শৈব ও শাক্তদের অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়বন, শাক্তগীতি, বৈষ্ণবদের পদাবলি, কৃষ্ণমঙ্গল, চরিতকাব্য, নাথপন্থীদের গোরক্ষবিজয়, সহজিয়াদের সাধনাসংগীত প্রভৃতি মূলত ধর্মনির্ভর মধ্যযুগের সাহিত্যে একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী রচনা বলতে ছিল কিছু প্রণয় কাহিনি-নির্ভর আখ্যান, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং অন্যান্য লোকসংগীত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান রাজত্বের অবসানে বাঙালির রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মোগল যুগে এদেশে এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। হোসেন-শাহী বংশের অবনতির সময় থেকে বহির্বাণিজ্য বাঙালির হাতছাড়া হতে থাকে এবং বিদেশি বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। তাই, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাধারণ বাঙালি ভূমি-উপজীবী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম করে অল্প কিছু সংখ্যক লোক বেশ লাভবান হল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। সমাজের উচ্চস্তরের এই অন্ত:সারশূন্য আড়ম্বর ও বিলাস ব্যসনের চিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজশক্তির পতনের সময়কালে বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রদেশের নবাবদের মধ্যেও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে তাদের বিলাসী উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং অক্ষম শাসনে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বর্গির হাঙ্গামা সমাজকে অস্থির ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য

দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অবশেষে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধবিদ্ধস্ত শিথিল সমাজজীবনে উন্নত সাহিত্যচর্চা ছিল কল্পনাতীত। অবক্ষয়ের সেই যুগে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-১৮৮৩ খ্রি:) পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রায় রামপ্রসাদ সেনের মতো কবিরা কাব্যরচনা করেছেন। এই সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই সময়ের কিছু বৈষ্ণব কবিতা, চরিত কাব্যগ্রন্থ, বৈষ্ণব নিবন্ধ-পদসংকলন, রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ, বিদ্যাসুন্দরকাব্য, সত্যনারায়ণ পাঁচালি, শৈবযোগী সম্প্রদায়ের ছড়া ও গাথা, নীতিকথা, ঐতিহাসিক গাথা, গণিতের আর্যা, ইসলামি বাংলায় রচিত আরবি-ফারসি উপাখ্যান-আশ্রয়ী কিস্‌সার সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া, ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বিদেশি ধর্মপ্রচারক ও বণিকেরা বাংলা শব্দকোষ সংকলন করেন এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা ও প্রসারের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য অভিঘাতে দেশবাসীর চিন্তা-চেতনায় অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি হয়, তাঁদের আধুনিক যুগের উপযোগী মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই পরিবর্তিত পরিমার্জিত ভাবনার প্রতিফলন কীভাবে সাহিত্যে এসেছে, ধর্মীয় আবেগ তথা ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন কীভাবে ঘটেছে, মানবচিন্তা, মানববোধ, মর্ত্যচিন্তা কীভাবে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে আমরা তারই সন্ধান করব।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন :

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত উনিশ শতকের বাংলায় অনেক নতুন অভিঘাত এলেও, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসাধারণের এক বিপুল অংশকেই তা প্রভাবিত করেনি। কিন্তু তবু, নগরে বসবাসকারী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে আধুনিক নবচেতনা এসেছিল, তা বাঙালিকে প্রচলিত প্রথার বিচার করতে যেমন সাহস জুগিয়েছিল, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে, আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটাতে তৎপর করে তুলেছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাবে, বহু স্মরণীয় গ্রন্থ রচনায়, সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে, সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও প্রসারে এই যুগটি বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। বাংলায় এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময়পর্বকেই 'নবজাগরণের কাল' বলা হয়ে থাকে, যার প্রভাব পড়েছিল ভারত জুড়ে। রামমোহন রায়ের সময় (১৭৭৫-১৮৩৩) থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১) পর্যন্ত সময়কেই সাধারণভাবে নবজাগরণের সময় রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন ১৭৫৭ সালে এক গতিশীল জাতির হাতে স্থিতিশীল আর এক জাতির পরাজয়ের মধ্যেই বাংলায় আধুনিকতার অস্ফুট সূত্রপাত ঘটেছে। এরপর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার সাহেবের শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আগমন, শ্রীরামপুর মিশনারিদের নানাবিধ উদ্যোগ, রামমোহন রায়ের কলকাতায় এসে বসবাস ও বিচিত্র কর্মোদ্যোগে আত্মনিয়োগ, ১৮১৫-য় 'আত্মীয়সভা' স্থাপন, ১৮১৭য় 'স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপন, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮য় স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও সাময়িকপত্রের আবির্ভাব, সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮২৪), জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৮৩০), মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), মতিলাল শীলস্ ফ্রী স্কুল অ্যান্ড কলেজ (১৮৪২), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), বিদ্যাসাগর কলেজ (১৮৭২), হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৩), বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৬), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স (১৮৭৬), বেথুন কলেজ (১৮৭৯), রিপন কলেজ (১৮৮৪, বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (১৯০৬, বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), আশুতোষ কলেজ (১৯১৬), ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর (১৮৫৬) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় হয়ে আছে। উপনিষদের মূল সূত্রগুলিকে উদ্ধার করে মনীষীগণ সাধারণ মানুষের অন্ধ সংস্কার দূরীকরণে (সতীদাহ, নদীবক্ষে সন্তান বিসর্জন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জাত-পাত ভেদাভেদ, জাতিগত ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি) সচেষ্ট হলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এ কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারও আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই সময়ে বাংলায় এক অভূতপূর্ব বৌদ্ধিক জাগরণ লক্ষ করা যায়। ধর্ম, জাতপাত, সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে সমাজমানসে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। সমাজে যৌক্তিকতার প্রসারে ও ধর্মীয় আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যার পথপ্রদর্শক ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর অনুগামী বন্ধু-শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, উমাচরণ বসুর নাম করা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮) বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার সভা হিসেবে স্মরণীয়, যেমন স্মরণীয় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত 'পার্থেনন' পত্রিকা, যেখানে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও শিক্ষায় ও আচার-আচরণে তাঁরা ইউরোপীয় চরিত্রের অনুবর্তী। মূলত ডিরোজিওর প্রভাবেই ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অনাস্থা, দেবদেবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের প্রতি অভক্তি ও খাদ্যখাদ্যে বিচারহীনতা ও বিদেশীয় চালচলনের অনুসরণের প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। অন্যায়, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহের কারণেই তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের অবদানের কথাও এই ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের পটভূমিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম নেতাদের প্রচেষ্টায় প্রাচীন বৈদান্তিক এবং ঔপনিষদিক ধর্মের নতুন মূল্যায়নে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্তি ঘটেছিল। তাঁদের একেশ্বরবাদের প্রচার সমাজকে সে সময় আলোড়িত করেছিল। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বহু ব্রাহ্ম্য ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং বিকাশসাধনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পুণ্য আদর্শ আজও 'রামকৃষ্ণমঠ ও মিশন' সারা বিশ্বজুড়ে পালন করে চলেছেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের পর সাহিত্যে নবজাগরণের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-পরবর্তীকালীন এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব মানুষের উপযোগী করে লেখা সমাজ-সমস্যামূলক নানা রচনায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র-প্রমুখ সাহিত্যকারদের কাব্য-কবিতা আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য, ঐতিহাসিক কাহিনি, নাটক, সমালোচনা প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার রূপ ফুটে উঠল। ঠাকুর-পরিবারের সদস্যেরাও এই সময়পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। উনিশ শতকে বিজ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ তাঁদের প্রতিভা ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

পূর্ববর্তী শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘনঘটা, মন্বন্তর প্রভৃতি কবিগান, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, ভক্তিগীতি আর প্রেমগীতিকার যুগে সাহিত্যে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাপর্বের গদ্যে, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের রচনায় সমাজের নানান অসঙ্গতি, ভাঙ্গাচোরা চেহারা ফুটে উঠেছিল। পরবর্তী গদ্যে সেই সমাজ-চেতনারই বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকসুলভ মনোবৃত্তি তথা যুক্তি তর্কের বাতাবরণ গড়ে উঠল। ছাপাখানার যুগের আধুনিকতা ও গতিশীলতার পূর্ণ সুযোগ সাহিত্য সেসময়ে গ্রহণ করল। মূলত পদ্য ও পুথিবাহিত সাহিত্যের যুগ শেষ হয়ে আধুনিক বাঙালির চিন্তা ভাবনা, জীবনজিজ্ঞাসা, ধ্যানধারণার বাহক গদ্যের প্রতিষ্ঠাই উনিশ শতকের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর বিদেশি সাহিত্যকারদের (শেক্সপিয়র, বায়রন, স্কট, মিলটন, কাউপার, পোপ, ড্রাইডেন প্রমুখ) রচনা, পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব অনিবার্যভাবেই এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিলো, একই সঙ্গে মাতৃভাষায় উন্নত সাহিত্যচর্চায়ও সাহিত্যিকেরা ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রের, বহুবিচিত্র সেইসব বিভিন্ন ধারার খোঁজ নেব।

বাংলা সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর দ্বারা বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়, আর তা ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাময়িকপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ছাপাখানার প্রচলনে সাময়িকপত্রের প্রসার ত্বরান্বিত হল। একাধিক লেখকের নানা লেখার সংকলন সাময়িকপত্র বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছল পাঠ্য পুস্তকের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে। ভাষার শক্তি যেমন বাড়ল, তা ক্রমশ সরল ও সর্বজনবোধ্য হতে লাগল। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা সময়ে আন্দোলনের ঢেউ সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও লক্ষ করা গেছে, তা হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম এবং সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার। এছাড়াও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পটভূমি হিসেবে সাময়িকপত্র তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সমালোচনা সাহিত্য প্রকাশেও সাময়িকপত্রের অবদান অপরিসীম। শুধু পাঠক এতে সুযোগ্য নির্দেশনা ও পরামর্শ পান তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে লেখকও উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী রচনায় মনোনিবেশ করে থাকেন। এমনও ঘটেছে, কোনো কোনো সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী, যেমন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', তারপরে 'বঙ্গদর্শন', এছাড়া আরও পরে বিংশ শতাব্দীতে 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতির সমস্ত ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন, কল্পনা, হতাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনার রূপায়ণ সাময়িকপত্রের সূচনা পর্ব থেকেই পত্রপত্রিকার পাতায় প্রতিফলিত হয়ে এসেছে।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে জনক্লার্ক এবং মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা (এপ্রিল, ১৮১৮) প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রের পথচলা শুরু হয়েছিল। অগণিত সাময়িকপত্রে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, ঝোঁকবদল, বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের রেখাপাত ঘটেছে। একই সঙ্গে মানুষের পরিবার, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে, নক্‌শা জাতীয় রচনায়-কবিতায়-প্রবন্ধে-আখ্যানে ধরা পড়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষা মথিত সামাজিক জীবন। শ্রীরামপুর মিশন থেকেই জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় খ্রিষ্টধর্মের মহিমা প্রচারমূলক 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩মে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙাল গেজেটি' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (প্রথম প্রকাশ ১৪মে, ১৮১৮) যদিও তার কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রথম উদ্যোগ হিসাবে 'বাঙাল গেজেটি' স্মরণীয় হয়ে আছে। 'সম্বাদকৌমুদী' ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের উদ্যোগে এবং তারাচাঁদ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহযোগিতায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। একসময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের এই মুখপত্রে ধর্ম, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ঐশ্বরিকতা, দেশ-বিদেশের খবর, উল্লেখযোগ্য চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। রামমোহন রায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়। এছাড়াও রঙ্গব্যঙ্গধর্মী, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের বিবরণমূলক ও সমাজ-সমস্যাসংক্রান্ত বহু লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮২৯ খ্রি: নীলরত্ন হালদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ-সাপ্তাহিকটির পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে রামমোহন

রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নিয়েছিলেন। সেকালের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় সম্পৃক্ত বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সম্বাদ প্রভাকর' (সংবাদ প্রভাকর) প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ সালের ২৫ মে'র পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৩৬ সালে তা পুন: প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক, তারপরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশের পরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে। এটিই ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই প্রথম সংবাদ-পরিবেশনের নিয়ম-কানুন লক্ষ করা যায়। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই পত্রিকার পাতায়—যেমন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া এই পত্রিকায় ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্তর মতো প্রখ্যাত প্রাচীন কবিদের, বহু কবিগান স্রষ্টা ও গায়কদের জীবনী প্রকাশ ও কাব্যের পর্যালোচনা করা হত। সংবাদ, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম বিষয়ে বহু মননশীল রচনা প্রকাশের পাশাপাশি রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনা প্রকাশ ও 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' আয়োজনের জন্যও পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৩১ সালেই দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৩ সালের প্রথম থেকে এর একটি ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু যুক্তিনির্ভর, আধুনিক রচনা সমাজকে আলোড়িত করেছিল এবং প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করেছিল। ১৮৩১ খ্রি: হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়' প্রকাশিত হয়। এখানে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত প্রকাশের পাশাপাশি প্রাণিবৃত্তান্ত ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ১৮৩২ খ্রি: প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকাও বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থেকেছে। ১৮৩৫ খ্রি: 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হলে বিদ্যাচর্চায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার বছর তিনেক পরে ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি-যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী সভার এই মুখপত্রটিতে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হত। দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ইউরোপীয় সংস্কৃতির তথ্যবহুল পরিচয় প্রকাশ এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পত্রিকাটি তার বিচিত্রস্বাদী রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির রুচি, আগ্রহ, সৃষ্টিশীলতাকে এক অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিলিতি 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মিত এই পত্রিকাটিতে পুরাবৃত্ত, মনীষীদের জীবনকথা, তীর্থক্ষেত্র-পরিচিতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য সমালোচনা—সবেরই সন্ধান মিলত। নানান ধরনের চিত্রসমৃদ্ধ এই পত্রিকায় মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই পত্রিকার স্মৃতি 'জীবনীস্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জ্ঞানচর্চার সঙ্গে শিল্পগত উৎকর্ষের যে সম্মিলন বিবিধার্থ সংগ্রহে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২ খ্রি.) পত্রিকায় তারই উজ্জ্বললতর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই দুই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ১৮৫৮

খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমাজ সমস্যামূলক রচনার পাশাপাশি কৃষকদের সচেতন করার প্রচেষ্টা, নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার—প্রভৃতি বিষয়ে এই পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেও বাঙালি মনীষার বিচ্ছুরণ ঘটেছে সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায়, বঙ্কিম লিখিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ও সাহিত্য সমালোচনায়, ব্যঙ্গনির্ভর কৌতুক রচনায়। এই পত্রিকার লেখকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পর কিছুকাল সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদনা করলে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেন। ১৩০৯-১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনার কালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা ও স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনা সমাজকে আলোড়িত করেছিল। এই সাময়িক পত্রে সেই যুগলক্ষণের নির্ভরযোগ্য দলিল লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'দিগ্‌দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা পর্যন্ত সাময়িকপত্রের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় এ সময়ে মূলত সংবাদ পরিবেশন, তথ্য আহরণ ও তা বিতরণেই সাময়িকপত্রগুলি নিয়োজিত থেকেছে। সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা সম্পর্কিত যুক্তিনিষ্ঠ ও নীতি-নির্ভর প্রবন্ধ-কবিতাই আলোচ্য কালপর্বে (১৮১৭-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ) রচিত হয়েছে। গদ্য ক্রমশ তার কাঠিন্য ও নীরসতা বর্জন করে সরস ও সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মূলত ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গড়ে ওঠা 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল অবদান ছিল। সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা, জ্ঞানচর্চা, ভাবস্ফূর্তি-এ সবই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটোগল্প প্রবন্ধ, কবিতা, রসরচনা, গ্রন্থসমালোচনা, সংবাদ প্রভৃতি বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) 'সাধনা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটলে তার প্রথম সম্পাদক হন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদিও এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩-এ তাঁর লিখিত একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন—'সাধনা' আমার হাতে কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্যছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না-একে আমি বরাবর আমার হাতে রেখে দেব।' সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি, কবিতা, গদ্য সবধরনের রচনাই 'সাধনা'য় মুদ্রিত হত। শাস্ত্রীয় আলোচনা থেকে সাময়িক পত্রকে মুক্তি দিয়ে তাকে বুদ্ধিনির্ভর পথে পরিচালিত করার অন্যতম পথিকৃৎ 'সাধনা' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দালিয়া', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস 'কৃতজ্ঞতা' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পত্রিকা। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য বিষয়ে যশস্বী ব্যক্তিবর্গ এই পত্রিকায় লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বঙ্গদেশের বাইরে এমন মাসিকপত্র বের করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 'প্রবাসী'

স্মরণীয় হয়ে আছে। এই পত্রিকা তার সর্বভারতীয় আবেদনে, প্রবাসী বাঙালির চিন্তার প্রতিফলনে, উচ্চমানের দেশি-বিদেশি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি মুদ্রণে উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯১৩ সালে) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায় মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সচিত্র পত্রিকা, যার প্রথম সংখ্যার সূচনা অংশ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর জলধর সেন এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', 'দেবদাস', 'দেনাপাওনা', 'দত্তা' প্রভৃতি উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের বহু রচনা প্রকাশিত হওয়ায় 'যমুনা' (প্রকাশ-১৯১৩, ধীরেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত) পত্রিকা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। এই পত্রিকায় তাঁর 'রামের সুমতি', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'পরিণীতা', 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয়েছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকার (১৯১৪) সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের নাম জড়িত। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত এই পত্রিকায় তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর (ছদ্মনাম, বীরবল) সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সবুজপত্র' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় যৌবনের বন্দনা, কৃত্রিমতা ও জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল। সাধুরীতি ছেড়ে চলিত ভাষা বা মৌখিক ভাষার উপর গুরুত্ব প্রদান এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বহু নতুন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতা, 'অপরিচিতা', 'হৈমন্তী' গল্প, 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' উপন্যাস, অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরে এই পত্রিকা প্রকাশের পর, বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের যুবমানসে যখন বঞ্চনা, হতাশা, গ্লানিবোধ ব্যাপ্ত হয়ে আসে, তখন, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ ও কবি দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রে আধুনিকতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সমস্ত ধরনের বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এর প্রতিটি রচনায় ঘোষিত হয়। রবীন্দ্র ভাবাদর্শ থেকে সরে এসে যাঁরা এই পত্রিকায় সাহিত্যসাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিত দত্ত প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি' সজনীকান্ত দাসের পরিচালনায় এবং যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলে কল্লোল বিরোধিতা তার অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে, যাতে প্রধান ভূমিকা নিতেন সজনীকান্ত দাস ও তাঁর অনুরাগীরা। রবীন্দ্র-সমালোচনাতেও 'শনিবারের চিঠি' ব্যাপৃত থেকেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ এই বিরোধিতামূলক সাহিত্য-পত্রিকায় সারস্বতচর্চা করেছেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। আবেগসর্বস্বতাকে দূরে সরিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'পরিচয়' পত্রিকা আত্মনিয়োগ করে। প্রগতিমূলক সমাজ ও সাহিত্য চিন্তার প্রকাশ এই পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায়, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সমর সেন, সমরেশ বসু, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ এই পত্রিকায়

লিখেছেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘কালিকলম’ পত্রিকায় কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরাই মূলত লিখতেন। আদর্শগত দিক থেকেও কল্লোলের সঙ্গে কালিকলমের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অজিত দত্তের পরিচালনায় প্রকাশিত ‘প্রগতি’ পত্রিকাতেও একই আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশিত হতো। এই একই ধারায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘কবিতা’ বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর লেখক-কবিরা নতুন কালের স্বপ্নকে এই পত্রিকায় বাণীরূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন প্রমুখ কবিরা এই পত্রিকায় লিখেছেন। এরই মধ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় ‘দেশ’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লেখনী ধারণ করেছেন। এই পত্রিকায় সাগরময় ঘোষের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, যোগেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ ‘দেশ’ পত্রিকার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের ধারা :

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও গানের আধিপত্যের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজেই গদ্যের প্রচলন লক্ষ করা যায়। বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যে দোম আন্তোনিওর ‘ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ’ এবং মনো-এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও রচিত ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ নামের প্রশ্নোত্তরমূলক রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্বকথা-নির্ভর গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। পর্তুগিজ পাদ্রি মনো-এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও পর্তুগিজ ভাষায় একটি বাংলা শব্দকোষ এবং একটি বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন যাতে সে দেশের ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে এসে সহজে দেশীয় ভাষা শিখে নিয়ে ধর্মপ্রচার করতে পারেন। এভাবেই বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের সূত্রে বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখা শুরু হয়। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা রাজ্য শাসনের জন্য বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে বাংলায় গ্রন্থরচনায় তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার মিশনারিরাই বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এই মিশনারিদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জশুয়া মার্শম্যান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের অনুবাদ, যিশুর চরিত-কাব্য-নিবন্ধ, বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার পাশাপাশি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ, বাংলা হরফে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও তাঁরা করেন। এতে এ যাবৎ পুথি নির্ভর বাংলা পদ্য-গদ্যের প্রসার বাড়ে। নতুন বাংলা হরফ হালহেড সাহেবের ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’-এ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারিদের দেশীয় ভাষা-শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে উইলিয়াম কেরি সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর গদ্যরচনা প্রচেষ্টার পরিচয় বাইবেলের বাংলা অনুবাদে, ‘ইতিহাসমালা’য়, ‘কথোপকথন’-এ বিধৃত রয়েছে। কথ্যভাষায় গদ্যরচনা করে তিনি পরবর্তী গদ্যকারদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেন। এছাড়া তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতের কিছু অংশ, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ, বাল্মীকি রামায়ণের মতো গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্কৃত, মারাঠি, পাঞ্জাবি, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় অভিধান গ্রন্থ, ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। কেরির সহযোগী পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুনসী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ। রামরাম বসুর

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আর 'লিপিমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ', চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' ইত্যাদি বাংলা গদ্য রচনার প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আরবি ফারসি শব্দ কিংবা সংস্কৃত শব্দে ভরা এসব পাঠ্যপুস্তক ছিল দুর্বোধ্য এবং অনুবাদ ও অনুকরণের গণ্ডিতে আবদ্ধ। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করলেন। ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতির কথা তিনি গদ্যে আলোচনা করে তার শক্তি প্রকাশ করলেন। তাঁর গদ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'পথ্যপ্রদান' ইত্যাদি। তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে প্রথম বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থও লেখেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন 'উপদেশকথা', 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবেও ডিরোজিওর এই ভাবশিষ্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ষড়দর্শন সংবাদ' একটি দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। মূলত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পরিচালনা সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর রচিত ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনামূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'ব্রাহ্মধর্ম', 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা', 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'খ্রীষ্ট ধর্মের ব্যাখ্যা', 'আত্মজীবনী' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় স্পষ্টতা, অনুভূতিপ্রবণতা, সহজ সরল বর্ণনা, সর্বোপরি উপনিষদের ভাবরসে জারিত মননের স্পর্শ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)-এর নাম স্মরণীয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ভবানীচরণ ব্যঙ্গাত্মক ও নক্শা জাতীয় রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, যার মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' উল্লেখযোগ্য। কলকাতার তৎকালীন বাঙালি সমাজ তাঁর বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিতে গ্রন্থগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচনায় বহু ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) রচিত অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বাংলার ইতিহাস', 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' 'ভ্রান্তিবিলাস', 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' প্রভৃতি, সমাজ সংস্কারমূলক রচনার মধ্যে 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ইত্যাদি, শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যান মঞ্জরী' ইত্যাদি, ছদ্মনামে লেখা হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীটি (বিদ্যাসাগর চরিত) একটি অসম্পূর্ণ রচনা। এছাড়া তিনি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে একটি ব্যক্তিগত শোক আখ্যান রচনা করেন। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক তাঁর একটি মৌলিক রচনা 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। কথ্য ভাষায়, হালকা ছাঁদে লিখিত তাঁর দুটি গ্রন্থ 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্ন-পরীক্ষা'। সাধু বাংলা গদ্যের সৌন্দর্য বিদ্যাসাগরে হাতেই বিকশিত হয়। ভাষার ওজস্বিতার সঙ্গে রচনার লালিত্য বিদ্যাসাগরের অবদান। তাঁর রচিত ভিত্তির উপরই পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-২৮৮৬) উনিশ শতকের মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক এই মানুষটির শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', তিন খণ্ডে বিভক্ত 'চারুপাঠ', 'ধর্মনীতি' এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা এবং বহির্বাণিজ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং বিজ্ঞান,

ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছন্দচারিতা তাঁর প্রবন্ধে অননুকরণীয় মননশীলতা এনেছে এবং বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির সার্থক প্রয়োগে তা যথেষ্ট প্রসাদগুণেরও অধিকারী হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিবাজী চরিত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮২৮-১৮৫৮) 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'পশ্বাবলী', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি অনুসরণকারীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'আশ্চর্য স্বপ্ন', 'স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলন', 'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিচার', 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' ১ম ও ২য় ভাগ, 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দুর আশা', 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রভৃতি। তাঁর গদ্য সাবলীল ও স্বাদু। আজীবন মাতৃভাষা চর্চা করেছেন ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে সোচ্চার থেকেছেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য দুটি গদ্যগ্রন্থ 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীস রাজ্যের ইতিহাস'। তিনি সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় গদ্য রচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ, 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স ও শিক্ষা সংক্রান্ত রচনাবলির মধ্যে 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'পুরাবৃত্তসার', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। সুললিত সংস্কৃত বহুল গদ্য তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে চলতি ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বের অধিকারী, এর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবু বিলাসে (১৮২৫) এই রীতির প্রবর্তন করতে গিয়ে সমধিক নিন্দিত হলেও ১৮৫৮-য় 'আলালের ঘরের দুলাল' -এ একই ধরনের গদ্যরীতির অনুবর্তন করে প্যারীচাঁদ পাঠক সমাজের প্রবল সমাদর লাভ করেন এবং টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর গদ্যরীতি 'আলালী গদ্য' নামে বিখ্যাত। প্যারীচাঁদের রচনাগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) প্রবন্ধ রচনা-'কৃষিপাঠ', 'যৎকিঞ্চিৎ' (২) জীবন-আখ্যান—'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', কথোপকথন মূলক নীতি আখ্যান-'রামারঞ্জিকা', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'বামাতোষিণী' (৩) সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা-'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (৪) ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শাজাতীয় রচনা—'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কী উপায়'। কলকাতার চলতি বুলির মাধ্যমে কৌতুক রসসৃষ্টি এবং বিভিন্ন খাঁটি বাংলা বাগ্‌ধারা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈতও বাগ্‌রীতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) ছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র, 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র এবং 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বল্পকালীন জীবনে একদিকে যেমন মহাভারত, গীতা অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত নাটক অনুসরণে 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'মালতীমাধব' নাটক ও 'বাবু' নামক প্রহসনও রচনা করেছেন, তেমনই তাঁর প্রতিভা নক্‌শা জাতীয় গদ্যে স্ফূরিত হয়েছে। বস্তুত এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতেই তিনি স্বরাট ও স্বমহিমায় বিরাজমান। 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে রচিত তাঁর সমাজ সচেতনতামূলক রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' আলালী গদ্যের চেয়েও সরেস, তীব্র শ্লেষাত্মক ও অধিকতর জীবনস্পর্শী ভাষায় রচিত। উনিশ শতকীয় কলকাতার ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলির কলুষ-কালিমা লিপ্ত ভ্রষ্টাচারময় উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী জীবনযাত্রার পরিচয় গ্রন্থটিতে লাভ করা যায়। কথ্য ভাষা যে তার যথাযথ উচ্চারণভঙ্গি নিয়েও সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দিয়েছেন।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) একদিকে যেমন রুশো, মিল, বেন্থাম, কোঁৎ প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের মানবতাবাদী ও উপযোগবাদী দর্শনের অনুরক্ত ছিলেন, শেষ বয়সে তিনিই ছিলেন হিন্দু দেশাত্মবোধের অন্যতম প্রধান উদ্‌গাতা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটি সম্পূর্ণ যুগ ধরে বাঙালি পাঠক সমাজের রুচি ও সাহিত্যবোধ তিনি যেমন নির্মাণ করেছেন, তেমনই মননশীল প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তার উপযুক্ত পাঠকও তৈরি করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে (১) জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক—'বিজ্ঞান রহস্য', (২) ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক—'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা', (৩) সাহিত্য-সমালোচনা মূলক—'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ, ২য় ভাগ), 'বিবিধ সমালোচনা'। (৪) সমাজ বিষয়ক—'সাম্য', 'লোকশিক্ষা', (৫) বিবিধ—'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গুণ মননশীলতা, যুক্তিবাদিতা, উপযোগবাদী মানবতাবোধ ও কল্যাণচিন্তা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশভাবনা, আধ্যাত্মিকতা ও কবিমনের কল্পনাদৃষ্টি। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দক্ষতা হল বিষয়ানুসারী ভাষা নির্বাচন ও তার ব্যবহার। 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'সাম্য' রচনায় যে ওজস্বিতা ও নিবিড় যুক্তি শৃঙ্খলা দেখা যায়, কমলাকান্তের কল্পনাবিলাসী চিত্রালংকার বহুল কাব্যধর্মিতার সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

বঙ্কিম সমকালের প্রাবন্ধিকদের অনেকেই ছিলেন তাঁর শিষ্যস্থানীয়। এঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ('সমাজ সমালোচনা' 'সনাতনী' 'রূপক ও রহস্য'), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ('বাঙলার ইতিহাস', 'নানা প্রবন্ধ'), চন্দ্রনাথ বসু ('শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব', 'বাঙালী সাহিত্যের প্রকৃতি', 'সাবিত্রীতত্ত্ব'), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (প্রভাতচিন্তা', 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'নিশীথচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা'), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বাল্মীকির জয়, 'মেঘদূত', 'ভারতমহিলা', 'প্রাচীন বাঙগালার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম'), সঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('যাত্রা সমালোচনা') দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('তত্ত্ববিদ্যা', 'স্বপ্নপ্রয়াণ'), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('গ্রীক ও হিন্দু'), কেশবচন্দ্র সেন ('সুলভ সমাচার', 'নববিধান', 'বালকবন্ধু', 'জীবনবেদ'), রামদাস সেন ('ভারত রহস্য', 'বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মনীতি'), রজনীকান্ত গুপ্ত ('সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ('গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত', 'চিন্তাতরঙ্গিনী'), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('মশলা বাঁধা কাগজ'), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ('সাহিত্যমঙ্গল', 'সোহাগচিত্র'), বীরেশ্বর পাঁড়ে ('বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু আদর্শ') রমেশচন্দ্র দত্ত ('মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য') প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) মূলত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত'—গ্রন্থদুটির জন্যই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে চিরকালীন স্থান করে নিয়েছেন। প্রথমটিতে নিজের শিক্ষকের এবং শেষোক্তটিতে নিজের জীবনচরিত্রের প্রসঙ্গে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে সরস, বস্তুনিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ', 'গৃহধর্ম', 'জাতিভেদ', 'রামমোহন রায়', 'বক্তৃতাস্তবক', 'মাঘোৎসবের উপদেশ', 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা', 'ধর্মজীবন' (তিন খণ্ডে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাস, 'জমিদারদর্পণ' নাটক ছাড়াও 'গো-জীবন', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'আমার জীবনী', 'মোসলেম ভারত', 'বিবি কুলসম' প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিরসন প্রসঙ্গে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সৎ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ন্যাসী, চিন্তানায়ক, দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬৩-১৯০২) তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতার সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা যেমন বর্ণিত হয়েছে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-শাস্ত্রের প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে এসেছে। দেশাত্মবোধ ও মানবতার কল্যাণের আদর্শ তাঁর সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত। তিনি তাঁর প্রবন্ধে ভাষায় চলিত রীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর প্রাঞ্জল, গতিময় ভাষাছাঁদ তাঁর ব্যক্তিস্বভাবেরই প্রতিরূপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোগল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিকে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাঁর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ, যেখানে দেশি-বিদেশি, প্রাচীন–আধুনিক নানান কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্য গ্রন্থ, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষা, ব্যাকরণ বা ছন্দ নিয়ে তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশ ও সমকালীন সমাজ-সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ' 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট' প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ করা যায়। 'শিক্ষা' গ্রন্থে শিক্ষা-সংক্রান্ত তাঁর রচিত যাবতীয় প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অধ্যাত্ম-দর্শনের কথা রয়েছে। তাঁর ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, রম্যরচনা, চিঠিপত্রের মতো ব্যক্তিগত রচনাগুলির মধ্যে, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি', 'জাপান যাত্রী', 'যাত্রী', 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'রাশিয়ার চিঠি', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পথের সঞ্চয়', 'ছিন্নপত্র', 'বাতায়নিকের পত্র', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), 'হিতবাদী', 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র সমকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ নাম স্মরণীয়। বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বহু বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি 'প্রকৃতি', 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা', 'জিজ্ঞাসা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'পদার্থবিদ্যা', 'মায়াপুরী', ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'চরিতকথা', 'কর্মকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'ভূগোল', 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'নানাকথা', 'জগৎকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রধানত সংকলনধর্মী তাঁর রচনাগুলিতে বক্তব্য ও বিষয়—উভয়েরই সমগুরুত্ব লক্ষ করা যায়। শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, নান্দনিকতা, স্বদেশ, সমাজ-সাহিত্য সংস্কৃতি-বিভিন্ন বিষয়ে লিখলেও সর্বক্ষেত্রেই তাঁর পরিমার্জিত সাহিত্যগুণ, সৃষ্টিশীলতা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় সহজ ও উপমাবহুল ভাষায় তিনি অনেক গুরুতর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এবং গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'তেল-নুন-লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'আমাদের শিক্ষা', 'রায়তের কথা', 'নানাচর্চা, 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়', 'আত্মকথা' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় চলিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি শব্দের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতা পূর্ণ রচনা তিনি যেমন লিখেছেন, তেমনই স্বদেশের নানা সমস্যার কথাও তাঁর বহু প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তাঁর

রচনায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বীরবল' ছদ্মনামেও তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রচিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'শকুন্তলা', ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনি', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'আলোর ফুলকি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ করা যায়। রূপকথা ও প্রাচীন লোককাহিনিকে ছোটোদের উপযোগী ভাষায় ও কল্পনায় রূপ দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিল্পতত্ত্বে জ্ঞান ও আগ্রহের পরিচয় 'ভারতশিল্প' ও 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থ দুটি অনবদ্য স্মৃতিকথাধর্মী আখ্যান। শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের সম্মেলনেই অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধি। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে অন্যতম। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এই বৈজ্ঞানিক আইস্টাইনের জীবনী লেখার পাশাপাশি 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান', 'শিল্প ও বিজ্ঞান', 'দেশবিদেশের বেতারচর্চা', 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক ও বিজ্ঞান-নির্ভর প্রবন্ধ লিখেছেন। কুসংস্কার দূর করে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যেই তাঁর এই সাহিত্য সাধনা। শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। শিক্ষণ পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দূর করার বিষয়ে তাঁর মতামত আজও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, গবেষক, পণ্ডিত তথা প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষাও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা লিপির উদ্ভব থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত অংশের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লিখিত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিচয়বাহী গ্রন্থ 'বৃহৎবঙ্গ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'রামায়ণী কথা', 'বেহুলা ও ফুল্লরা', 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান', 'পদাবলী মাধুর্য' তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) 'চিত্র ও কাব্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে আপন প্রতিভার মৌলিকতার স্পর্শ রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতো। তাঁর কাব্যধর্মী রচনাগুলিতে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনাগুলিকে-কাব্য সঙ্গীত ও সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কে রচনা, চিত্রধর্মী রচনা, দেশ ও জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় রচনা, দার্শনিক রচনা—ইত্যাদি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রখ্যাত সমাজসেবী ও সুসাহিত্যিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি 'সওগাত' 'নবনূর', 'ধূমকেতু', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায় নারীমুক্তি ও নারী জাগরণ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হাস্যরসের গল্প রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় রাজশেখর বসু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উত্তরাধিকারী। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে রূপ দিয়েছেন। তথ্যের সঙ্গে শ্লেষ তাঁর রচনায় সমাজ বাস্তবতাকে আরো গভীর করে তুলছে। ভাষা চিন্তা বিষয়ক তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ হলো 'গ্রহণীয় শব্দ', 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার', 'বাংলা ভাষার গতি', 'ভাষার বিশুদ্ধি' ইত্যাদি। এছাড়া জীবিকা, ধর্ম, কুটির শিল্প, খনিজ পদার্থ, সাহিত্যিকের ব্রত, সাহিত্যের পরিধি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক কালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। 'সবুজপত্র' পত্রিকার এই বিশিষ্ট লেখক (১৮৮৪-১৯৬১) 'কাব্য জিজ্ঞাসা' নামে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো—'নদীপথে', 'ইতিহাসের মুক্তি', 'জমির মালিক', 'শিক্ষা ও সভ্যতা' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, সৈয়দ মজুতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮-১৯৫২) কাব্যরচনার পাশাপাশি বহু সার্থক ও স্মরণীয় প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন, যার মধ্যে 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য (উনিশ শতক), 'বঙ্কিম বরণ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'সাহিত্য বিচার', 'সাহিত্য কথা', 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য', 'বাংলার নবযুগ', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' উল্লেখযোগ্য। মূলত সমালোচনামূলক এসব গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ প্রসূত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কিছুকাল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং এই পত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর 'সাংস্কৃতিকী', 'ভারত সংস্কৃতি', 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। বাংলায় লেখা তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে' প্রভৃতি। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এই খ্যাতনামা মনীষী তাঁর রচনায় বিষয়ের ব্যাপ্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুক্ত পণ্ডিত ও গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস' রচনায় তাঁর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জীবনী সংকলনে তাঁর প্রতিভার অনন্যতার স্পর্শ মেলে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে আরেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থরাজির মধ্যে রয়েছে 'ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা স্থান নাম', 'বাংলায় নারীর ভাষা', 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ খণ্ড), 'ভারতীয় আর্যসাহিত্যের ইতিহাস', 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি। 'গল্পের ভূত', 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি', 'কলকাতার কাহিনি', 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস', 'বটতলার ছাপা ও ছবি' প্রভৃতি গ্রন্থে বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও আলোচনার সরসতা লক্ষ করা যায়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দিনের পরে দিন যে গেল' অত্যন্ত সুললিত গদ্যে রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মধ্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-কার এই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি। তিনি বহু লেখকের রচনাবলির ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর আত্মকথামূলক রচনা 'স্মৃতি বিস্মৃতির দর্পণে' একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে আস্বাদনধর্মী রচনাশৈলীর বেণীবন্ধন তাঁর রচনায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বিখ্যাত ছাত্র ও পরবর্তীতে অধ্যাপক সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২) রবীন্দ্র-স্নেহধন্য ছিলেন। বাংলায় রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপ', 'জাপানী শাসনের আসল রূপ', 'ইতিহাসের ধারা', 'সমাজ ও ইতিহাস', 'ইতিহাস চর্চা', 'প্রসঙ্গ ইতিহাস', 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রভৃতি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্যে অদ্বিতীয়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৮৬১) অনুবাদ সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতীয় ঐতিহ্য, সঙ্গীত, দর্শন, রাজনীতি—বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তাঁর রচিত 'মনে এলো', 'বক্তব্য', 'আমরা ও তাঁহারা', 'চিন্তায়সি', 'উপক্রমণিকা', 'কথা ও সুর' প্রভৃতিগ্রন্থে নানান স্মৃতিচারণা, তাঁর পরিচিত মনস্বী ব্যক্তিত্বের বর্ণনা, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির উদ্ভাস এবং সংগীতচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। স্মৃতিচারণ, শিল্পী জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণ ঘটেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) অজস্র দিনলিপিতে, যার মধ্যে রয়েছে—'অভিযাত্রিক', 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর', 'উৎকর্ণ' প্রভৃতি। তাঁর রচিত বহু গল্প উপন্যাসের আদিবীজ এই দিনলিপিগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। কর্মসূত্রে 'উপাসনা', 'বিচিত্রা', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৬৪)-র বিভিন্ন রচনাতেও এক বিশেষ সময়পর্বের ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'স্মৃতিচিত্রণ', 'আমি যাদের দেখেছি', যখন সম্পাদক ছিলাম, 'পত্রস্মৃতি', 'পথে পথে' প্রভৃতি। তাঁর 'পরাশর শর্মা' ছদ্মনামে লিখিত বা রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনাগুলির চাইতে এ ধরনের রচনাগুলিতেই তিনি বেশি সার্থক হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হলো 'সাহিত্যের সত্য', 'ভারতবর্ষ ও চীন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লি'। 'মস্কোতে কয়েকদিন' তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন', 'বৈশাখের স্মৃতি' ইত্যাদি। তাঁর বিচিত্রস্বাদী প্রবন্ধে কখনো সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, কখনো ভ্রমণের দিনলিপি, কখনো বক্তৃতার লিখিত রূপ, কখনো স্মৃতিচারণ বিষয় হয়ে এসেছে। গুরুত্ব দিয়েছেন স্থানিক ইতিহাসকে, পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতিকে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ হলো—'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ'। যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল, দার্শনিক এই কবির বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজের কথা, শিল্প প্রসঙ্গ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের জীবন ও রচনার অনুষঙ্গ, বিভিন্ন গ্রন্থ সমালোচনা, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখিত বহু প্রবন্ধের মধ্যে 'কাব্যে ধারণাশক্তি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার প্রবন্ধে নীরসতত্ত্ব রচনাশৈলীর গুণে ও অনুভবের সহজ অভিব্যক্তিতে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক, 'প্রবাসী', 'ফরওয়ার্ড', 'ওয়েলফেয়ার', 'স্বাধীনতা'—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা', 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা', 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা', 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালি সংস্কৃতির প্রসঙ্গে', 'বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি', 'বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'য় বাঙালির বিপুল ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। বহুভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় গদ্যশিল্পী। তাঁর অজস্র গদ্য গ্রন্থের মধ্যে স্মরণীয় 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনি', 'শবনম', 'শহর ইয়ার' ইত্যাদি বহুদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় উজ্জ্বল বিভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। সরস গল্প বলার ভঙ্গিতে ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতির কথা তিনি অননুকরণীয় ভাবে শুনিয়েছেন। 'জলে ডাঙায়' তাঁর লেখা অনবদ্য ভ্রমণকাহিনি। রসিক এই গদ্যশিল্পী ফিচারধর্মী বা রম্যরচনামূলক-প্রবন্ধের নানা রূপেই অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০৩) ছড়া কবিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বহু মননশীল প্রবন্ধও রচনা করেছেন, যার মধ্যে 'পথে প্রবাসে', 'বাংলার রেনেসাঁস', 'শিক্ষার সংকট', 'সংস্কৃতির বিবর্তন', 'বিনুর বই' উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'পারিবারিক নারী সমস্যা', 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' ইত্যাদি প্রবন্ধ বিখ্যাত।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) বাংলা প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতার সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ—'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা', 'পান্থজনের সখা', 'পথের শেষ কোথায়', 'ব্যক্তিগত ও নৈর্বক্তিক' ইত্যাদি। রবীন্দ্র উত্তরকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্যতম কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে 'উত্তরতিরিশ', 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা', 'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' ইত্যাদি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের তাঁর রচনায় বুদ্ধদেব বসু নানাভাবে স্মরণ করেছেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা কাব্যময়, রুচিশীল, বিশিষ্ট গদ্যরীতিতে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। শুধুই বড়োদের কথা নয়, 'বাংলা শিশু সাহিত্য' বিষয়েও তাঁর সুললিত প্রবন্ধ রয়েছে। রসজ্ঞ লেখক তাঁর প্রাজ্ঞ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে কাব্যিক উপমায়, ছন্দে, সুরে, ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'রুচি ও প্রগতি', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ', 'সেকাল থেকে একাল' ইত্যাদি। তাঁরা প্রবন্ধে চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সমাজ স্থান পেয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) 'কালপ্যাঁচা' ছদ্মনামে বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা', 'কলকাতার কালচার', 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', 'বাংলার নবজাগৃতি', 'লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আধুনিক সময়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্য কবিতার ধারা :

কবিগান—কবিওয়ালা বলতে বোঝানো হতো অশিক্ষিত পটু স্বভাব কবিদের। বহু বিচিত্র ধরনের রচনাকে কবিগানের আওতায় আনা যেতে পারে। সজনীকান্ত দাসের ভাষায় 'বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় প্রচলিত তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্ক গীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে।' ঐতিহাসিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়সীমায় নবাগত ইংরাজের নবগঠিত রাজধানী কলকাতায় হঠাৎ বড়লোক অনভিজাত ও স্থূল রুচির ধনাঢ্য মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাৎক্ষণিক আমোদের উত্তেজনার আস্বাদনকল্পে এই শিল্পমাধ্যমটির জন্ম। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল তথা গায়ক কোনো একটি বিষয় নিয়ে পূর্বে রচিত বা তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনা করে চাপানউতোর নামক প্রশ্নোত্তরের ঢঙে একে অপরকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে। ঢোল, করতাল সহযোগে প্রতিপক্ষের গায়কেরাই নিজ নিজ দোহার নিয়ে গান পরিবেশন করতেন। কবির আসরে ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ এবং বিরহ অংশের পর সর্বশেষে লহর বা খেউড় গাইবার নিয়ম ছিল। এই খেউড় অংশটি পারস্পরিক গালিগালাজ পূর্ণ হওয়ায় তৎকালীন শ্রোতৃমণ্ডলী এই অংশেই আমোদ অনুভব করতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে গোঁজুলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, নন্দলাল, লালচন্দ্র, রামজী দাস, রাসু ও নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে, নিলু ও রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রামানন্দ নন্দী, রাম বসু, কেষ্টা মুচি, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্টপোষকতায় কুলুই চন্দ্র সেন উত্তর-প্রত্যুত্তরহীন শাস্ত্রীয় সংগীত ঘেঁষা আখড়াই গানের প্রবর্তন করেন। আখড়াই ভেঙে তৈরি হাফ-আখড়াই গানে আবার চাপান-উতোর রীতি ফিরে আসে। আঙ্গিকগত খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া কবিগানের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। টপ্পা গানের বিশেষ উৎকর্ষ বিধান ও পরিণতিদানে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম অবশ্য স্মর্তব্য।

'টপ্পা' শব্দের অর্থ 'লাফ'। আর এক অর্থে তা বোঝায় 'সংক্ষেপ'। অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়ালের সংক্ষিপ্ততর, তুলনায় লঘু সুরের গানই হলো 'টপ্পা'। কর্মোপলক্ষ্যে বিহারের ছাপরা জেলায় বসবাসের অভিজ্ঞতা ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার তালিমকে কাজে লাগিয়ে নিধুবাবু বাংলা ভাষায় প্রণয়াশ্রিত, সৌন্দর্য পিপাসা ও দেহবাসনা নির্ভর টপ্পা গানের প্রবর্তন করেন। নিধুবাবুর পর শ্রীধর কথক, কালী মির্জা এবং বিশিষ্ট পক্ষীর দলের নেতা রূপচাঁদ পক্ষী প্রমুখ টপ্পা, কথকতা ও শ্যামা বিষয়ক গানের এই ধারাকে অগ্রসর করেছেন। পাঁচালিকার হিসেবে দাশরথি রায় ছিলেন বিখ্যাত। ঢপকীর্তনের প্রবর্তক হিসেবে মধুসূদন কিন্নর বা 'মধুকান' স্মরণীয় হয়ে আছেন। পাঁচালি এবং কীর্তনের সংমিশ্রণে এই নতুন আঙ্গিকটির জন্ম হয়। যাত্রাগানের সঙ্গেও পাঁচালির সম্পর্ক রয়েছে। গোপাল উড়ে ছিলেন যাত্রার গানে অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ। কবিগানের আরেক রূপান্তর তরজা। এখানেও কবিগানের মতো উতোর-কাটাকাটি রয়েছে। তবে ঝুমুরের সঙ্গেও এর সম্পর্ক বেশি। গানের সঙ্গে এখানে নাচও পরিবেশিত হয় এবং ভাব, ভাষা ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে তা আজকের দর্শক শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে।

নতুন আর পুরনো যুগের কবিতার মধ্যে সেতুর মতো হলেন ঈশ্বর গুপ্ত। দেবতা আর পুরাণ থেকে সরে এসে সমকালীন জীবনের ছবি দেখা গেল তাঁর কবিতায়। হয়তো সামগ্রিকভাবে জীবনের ছবি সেগুলি নয়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনেরই সঙ্গে জড়িত; যেমন, ষড়ঋতুর সৌন্দর্য থেকে আনারস, ইংরেজি নববর্ষ, নারকেল, পিঠেপুলি, তপসে মাছ ইত্যাদি। কিন্তু শুধু জীবনের এই খণ্ডিত ছবিই নয়, বিদেশি রাজশক্তি এবং বিদেশি মনোভাবাপন্ন বাঙালিদের তিনি বিদ্রুপ করেছেন, প্রকাশ করেছেন স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ব; পাশাপাশি অবশ্য রক্ষণশীলতার কারণে স্ত্রীশিক্ষার মতো বিষয়কে মেনে নিতে পারেননি। আসলে যুগসন্ধির এক ব্যক্তিত্বের মতোই পুরনো মানসিকতা, অলংকার-উপমা ব্যবহারের দিক থেকে যেমন তিনি মুখ ফেরাতে পারেন নি, অন্যদিকে তিনিই আবার বিষয়বস্তু, শব্দ ব্যবহার এবং কবিতায় সাংবাদিকসুলভ ভঙ্গিতে নতুন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমসময়ে ইংরেজি শিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি ইংরেজিতে কবিতা লিখতে থাকেন। এই ধারার প্রথম গণ্য কবি ডিরোজিও, যদিও বংশগতভাবে পর্তুগিজ, ধর্মের দিক থেকে নবযুগের জিজ্ঞাসু আর ইয়ং বেঙ্গলের মন্ত্রগুরু তিনি ভারতকে 'মাই কান্ট্রি' বা 'স্বদেশ আমার' বলে সম্বোধন করেন। এ পথের পথিকদের মধ্যে কালীপ্রসাদ ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, অরু দত্ত-তরু দত্ত এবং সংযুক্তার উপাখ্যান নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ক্যাপটিভ লেডি'র উল্লেখ করতে হয়।

বাঙালির ইংরেজি কবিতা লেখার প্রয়াসের এই ক্ষীণ ধারাটির পাশে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৬-১৮৬৭) কথা বলতেই হয়, কারণ বাংলা কবিতার যৌবনে মধুসূদনের ভূমিকার আগে রঙ্গলালের হাতেই তার কৈশোর মোক্ষণ। তিনি প্রথম যুগে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংবাদ প্রভাকরে কাব্যচর্চা করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় উনিশ শতকীয় আখ্যান কাব্যের ধারার প্রবর্তক হিসেবে। ১৮৫৮ সালে হোমারের কাব্য অনুসরণে লেখেন 'ভেক ও মুষিকের যুদ্ধ'। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' বাংলা কাব্যের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, অন্যদিকে বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রসারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কাব্যটির 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে

চায়' পংক্তিটি প্রায় প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশরীতিতে প্রাচীনপন্থী ও ঈশ্বর গুপ্তের ধারানুসরণ করলেও বিষয় নির্বাচন ও কবি-মানসিকতায় যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন।

বাংলা কবিতায় ঐতিহ্যমণ্ডিত গীতিকবিতার পাশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে সৃষ্টি হলো সাহিত্যিক মহাকাব্যের যুগ। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নেওয়া মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। হিন্দু কলেজে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসুকে আর অধ্যাপক হিসেবে রিচার্ডসনকে। বাল্যকালে মাতা জাহ্নবীর কাছে রামায়ণ, মহাভারতসহ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে মধুসূদনের মায়ের লাইব্রেরি 'was complete with 'Mahabharata', 'Ramayana', 'Chandi', 'Annada Mangal', etc, the few Bengali books then extent' পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বার যখন উন্মুক্ত হলো, হোমার-ভার্জিল, তাসো-দান্তে-মিলটন এবং আরো অনেক কবির প্রভাব পড়ল তাঁর উপর, তখনও তিনি ভোলেননি কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসকে। যাই হোক, হিন্দু কলেজে পাঠ নেওয়ার পর খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা এবং মাদ্রাজে খ্রিস্টান বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'The Captive Ladie' ও 'Visions of the Past' ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হওয়ার পথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শে বাংলা কবিতায় তাঁর আবির্ভাব ঘটে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'হেক্টর বধ' লিখে নিজেই এক যুগের সৃষ্টি করে গেলেন তিনি। 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই বাংলা ভাষায় লিখিত সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য। মধুসূদন ছিলেন প্রকৃতি অর্থেই নবজাগরণের কবি। একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার মিশ্রণে তিনি তৈরি করলেন মানবতাবাদের নতুন ব্যাখ্যা।

তাঁর কবিতার চরিত্রগুলি হিন্দু দেবদেবী ও পুরাণের চরিত্রই, কিন্তু 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' দুই অসুর-চরিত্র সুন্দ ও উপসুন্দ যেন দেবতাদের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ বীরত্বে, হতাশায়, বিষাদে উনিশ শতকের এক বাঙালি পুরুষ। ব্রজাঙ্গনায়, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' 'বীরাঙ্গনা'য় 'রাধা', 'প্রমীলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শকুন্তলা', 'তারা', 'রুক্মিনী', 'দ্রৌপদী', 'জনা' যেন নতুন দিনের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠলেন। এভাবেই প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণ কথাকে ব্যবহার করে সমকালীন মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে পুনর্বিচার করেছেন তিনি।

শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, কবিতার ফর্মের দিক থেকেও তার কাব্যজগৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শের একটি সার্থক সমীকরণ। Blank verse এর অনুসরণে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত পয়ার ছন্দের ঐতিহ্য পরম্পরায় মধুসূদন গড়ে তুললেন প্রবাহমান পয়ারের এক নতুন রূপভেদ, যা পরবর্তী সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে বিখ্যাত হয়েছে। 'বীরঙ্গনা' কাব্যে আবার রোমান কবি ওভিদের 'Heroides' অবলম্বনে বাংলায় প্রথম Epistle বা পত্রকাব্য রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলায় প্রথম সনেট আঙ্গিকের রচনা। এই সনেটগুলির কয়েকটি প্রাচীন রোমান কবি পেত্রার্ক এবং শেক্সপিয়রের সনেটের আদর্শে রচিত। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে লেখা 'হেক্টরবধ' সম্পূর্ণ করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মধুসূদন একই সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতুর ভূমিকা পালন করে বাংলা কবিতাকে যেমন বিরাট বিশ্বের পরিসরে মুক্তি দিয়েছিলেন, সাবালক করে তুলেছিলেন, তেমনই যুগের দাবি অনুসারে ওজ:ময়

ও গম্ভীর ক্লাসিকাল তন্নিষ্ঠতা এবং লিরিকাল ও রোমান্টিক আবেগময়তার দুটি বিপরীত বিন্দুর মধ্যে অনায়াসে সঞ্চরণ করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে বাংলা কাব্য-কবিতার ভুবনকে নতুন বিশ্ব আবিষ্কারে প্রাণিত করেছে।

মধুসূদনের অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) বা নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) মহাকাব্য রচনায় প্রয়াসী হলেও সেগুলির কোনোটাই আখ্যানকাব্যের বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে না। হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫-৭৭), 'আশাকানন' (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), 'চিত্তবিলাস' (১৮৯৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পলাশীর যুদ্ধ' ছাড়া তাঁর মহাভারত-নির্ভর ত্রয়ী কাব্য অর্থাৎ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস আলাদাভাবে উল্লেখের যোগ্য। আখ্যানকাব্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র (ললিততথা মানস), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (ভারতগাথা), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্ধার), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্ন প্রয়াণ), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্তমুকুর), আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা কাব্য), শিবনাথ শাস্ত্রী (নির্বাসিতের বিলাপ), রাজকৃষ্ণ রায় (নিভৃত নিবাস) উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতার ধারায় মহাকাব্য ছিল এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। এক ব্যক্তির অসামান্য প্রতিভাবলে নি:সঙ্গ দ্বীপের মতো রচিত হয়েছিল সাহিত্যিক মহাকাব্য। যদিও সে মহাকাব্যে ধ্রুপদী বয়নের মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে গীতিকবিতা। মধুসূদনের ভেতরেও গীতিকবিতার মূর্ছনাও যে নিত্য প্রবহমান ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাঁর সনেটে। মধুসূদনের পর স্বাভাবিকভাবেই ফিরে এস গীতিকবিতার ধারা, এবং যে গীতিকবিতা এতদিন নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধনভজনের গানের মধ্যে দিয়ে চলে আসছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাতে যুক্ত হলো মানবিক আবেগের ধারা। মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকল এ সময়ের কবিতা—নারী, প্রকৃতি ও স্বদেশ। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস এ যুগের কাণ্ডারী।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত শংসাপত্র সত্ত্বেও খুব বড়ো কবি হিসেবে স্থান পাওয়ার তিনি অধিকারী কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তবে তাঁর প্রধান গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার মূল সুরটিকে ধরতে পারায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম প্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৮৯)। নিসর্গ কবিতা রচনার প্রয়াস, রোমান্টিক অনুভূতির আবাহন এবং ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন—বাংলা কবিতার এই বৈশিষ্ট্যগুলির অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠার কাজ বিহারীলালের হাত ধরেই সম্পন্ন হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহারীলাল চক্রবর্তী নির্দেশিত গীতিকবিতার পথে কবিতা লিখে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুল্লরা' নামক দুটি আখ্যানকাব্য রচনা করলেও তিনি পরবর্তীকালে গীতিকবিতার পথই বেছে নেন। তাঁর বিখ্যাত গীতিকাব্য 'মহিলা'। তাঁর মৃত্যুর পর এই কাব্যের প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ সেন নিজেকে 'মাইকেল মধুসূদন হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি' বললেও, বিহারীলালের দ্বারাই তিনি সর্বাধিক প্রভাবিত। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'পারিজাতগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'অপূর্ব বীরঙ্গনা', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' ইত্যাদি। বিচিত্র

অলংকারে গড়া তাঁর কবিতাগুলিতে গার্হস্থ্য প্রেমের রোমান্টিকতা ও প্রকৃতির সমৃদ্ধ চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় সম্বোধনের রীতি বিহারীলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'স্বভাব কবি' গোবিন্দচন্দ্র দাসের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'প্রসূন', 'প্রেম ও ফুল', কুঙ্কুম, 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'ফুলরেণু', 'বৈজয়ন্তী' ইত্যাদি। 'ভোগবাদী' কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেও তাঁর কবিতায় স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'প্রেম-বৈচিত্র্যের কবি' অক্ষয়কুমার বড়ালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো-'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা'। বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো কল্পনাভিসার অক্ষয়কুমারের কবিতায় থাকলেও তাতে অতীন্দ্রিয়তা নেই। স্ত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত 'এষা' (১৯২২) কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। ভাবে উচ্ছ্বাসের চেয়ে তাঁর কবিতায় ভাষার সংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূলত গদ্যসাহিত্যের লেখক হলেও রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৩) গীতিকাব্যের জন্য কবিতা-ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই কাব্যটি রোমান্টিক রহস্যময়তায়, ভাবের প্রাচুর্যে, রচনার বিচিত্রতায় অনবদ্য। এটি কবি Spencer এর 'Faerie queene' এর আদর্শে রচিত।

ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু সে-সব কবিতা ছিল কাব্যগুণে বঞ্চিত। উনিশ শতকের শেষের দিকেই বেশ কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা পাওয়া যায়, যাঁরা পাঠক সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী সরস্বতী, প্রমীলা নাগ, ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার প্রসারের পটভূমিতে, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এঁদের সাহিত্যসাধনা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও স্মরণীয় হয়ে আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাস', 'শিখা', 'অর্ঘ্য' ইত্যাদি। তার কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা এবং করুণরসের আধিক্য লক্ষ করা যায়। কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'আলো ও ছায়া', 'নির্মাল্য', 'মালা ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবন পথে'। শোকমূলক কবিতায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যচর্চায় বিহারীলাল চক্রবর্তী ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ করা যায়। নারী জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রেম-উচ্ছ্বাসকে তিনি কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'গাঁথা', 'কবিতা ও গান'। সমকালীন গীতিকবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নতুন পথ নেয়। ....কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না'। কাব্যের এই ঋতু-বদলের কথা স্মরণ রেখে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গদ্যকাব্য এবং ছন্দোবদ্ধ কাব্য—উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম পর্বের রচনার মধ্যে রয়েছে 'বনফুল' (১২৮২-৮৩ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত), 'কবি কাহিনী' (১২৮), 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১২৮৪-১২৯০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (গীতিনাট্য) প্রভৃতি। তাঁর স্বকীয়তার বিচ্ছুরণ, প্রতিভার বিকাশ ক্রমশ লক্ষ করা গেছে

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১২৮৮), 'প্রভাতসংগীত' (১২৯০), 'ছবি ও গান' (১২৯০), 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে। প্রভাত সংগীত রচনার সময়পর্বে প্রকৃতির প্রসারতা ও মানব জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবির যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় তাঁর হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা কেটে গেছে এবং তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা ও ছন্দ ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রভাত সংগীতের পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গানে'র পর রবীন্দ্রনাথের বধূ সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাসমৃদ্ধ 'কড়ি কোমল' (১২৯৩) প্রকাশিত হলে, তাতে তাঁর মর্ত্যমমতা, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব ও প্রকাশ লক্ষ করা গেল। 'মানসী' (১২৯৭) ও 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্যগ্রন্থে বিশ্বাত্মবোধে, ছন্দ ও ভাষার আড়ষ্টতা থেকে মুক্তিতে, সৌন্দর্যব্যাকুলতা ও নিসর্গচেতনাময় রোমান্টিক কল্পনার বিস্তারে তাঁর কবি প্রতিভার যথার্থ উন্মেষ ঘটেছে। 'চিত্রা' (১৩০২) কাব্যগ্রন্থে মানবপ্রেম তথা মানবতাবোধ, সৌন্দর্যকে সীমা ও অসীমে পরিব্যাপ্ত করে দেখার মনোভাব, কর্মচঞ্চল জীবনের আহ্বানে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির চেতনা, দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জনে ঔৎসুক্য লক্ষ করা গেল। সমসাময়িক 'মালিনী' নাটকেও এই আদর্শেরই সম্প্রসারণ। 'চিত্রা'র পরবর্তীকালে 'চৈতালি' (১৩০২) কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ধ্যানগম্ভীর, শান্ত আদর্শে কবি উদ্বুদ্ধ। এছাড়া এই কাব্যে সুখ-দুঃখ, মহত্ত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কল্পনা' (১৩০৭) কাব্যেও লক্ষণীয় সেই অতীত স্মৃতিরই অনুধ্যান। এখানে অতীতমুখী কবিমন প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য স্মৃতিতে বিভোর। প্রায় একই সময়ে রচিত তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা'। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক আখ্যায়িকা থেকে গৃহীত বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা ও নাট্যকবিতা স্থান পেয়েছে 'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা'য়। সমাজ ও স্বভাবধর্মের ওপর মনুষ্যধর্মের জয়ঘোষণার পাশাপাশি ত্যাগ যে কত মহনীয় হতে পারে, তা কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থে আবেগ উচ্ছলতা সংযত হয়ে সাধারণ জীবনের চারপাশের ভাব থেকে রূপক বেছে নিয়ে নীতিনির্ভর, দার্শনিকতা প্রধান অজস্র কবিতা রচিত হয়েছে। 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি গীতকবিতার অসামান্য নিদর্শন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে ঈশ্বরের প্রতি শান্ত, সমাহিত, ঐকান্তিক অনুরাগের ছবি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই সবরকম সংস্কারমুক্ত সত্যধর্ম উপলব্ধিরও প্রকাশ ঘটেছে। স্বদেশকেও সেই সত্যসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন কবি। এই কাব্যে ভগবানের কাছে তাঁর ও দেশবাসীর জন্য কবির পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রার্থনা তাঁর 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' তৈরির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। স্ত্রী বিয়োগের পটভূমিতে রচিত 'স্মরণ' (১৩০৯) কাব্যে মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধীয় বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। শিশুমনের খেয়ালি কল্পনা ও রহস্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে 'শিশু (১৩১০) কাব্যগ্রন্থে। অসীমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে 'উৎসর্গ'-এর কবিতায়। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মধ্য থেকে জীবনের পূর্ণতার অনুধ্যান ভগবদ্‌ভক্তির অনুভূমিতমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যে বিচিত্র বর্ণসুষমায় উদ্ভাসিত, তারই পরিণতি পরবর্তী গানের সংকলনগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে, যেখানে তাঁর ভগবৎপ্রেম আরো স্নিগ্ধ, গভীর, তত্ত্বপ্রধান ও অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভগবৎবিশ্বাস এখানে বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-সুফি মরমিয়াদের অনুরূপ। তা যেন মানবপ্রেমেরই বিস্তৃত প্রকাশ, যে প্রেমে ঈশ্বরও তাঁর বন্ধুর রূপ পরিগ্রহ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হলো। সংস্কারমুক্তি ও গতির বাণী নিয়ে এসে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যের দিক পরিবর্তনকে সূচিত করেছে। 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া'র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যছন্দের নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। 'বলাকা' পরবর্তী 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনি নির্ভর বাস্তবধর্মী কবিতা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি অজানা জগতের প্রতি আকর্ষণ ও

অলক্ষ্য থাকেনি। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে গতিবাদের সুর। 'পূরবী'তে যেখানে কবি আত্মসমীক্ষায় নিমগ্ন, 'বনবানী' কাব্যে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচিতির বিস্ময়বোধ ও বিশ্বসৌন্দর্য দর্শনজনিত আনন্দের প্রকাশে তন্ময়, 'মহুয়া'য় সেই তিনিই আবার প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে ও নারীবন্দনায় মুখর। 'পরিশেষ'-এর কবিতাগুলি বিবাহ, নামকরণ প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ ঘটনা নিয়ে রচিত। গদ্যছন্দের সৃষ্টি ও পরীক্ষার পর্বে তাঁর 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে 'শেষসপ্তক', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি। অষ্টাদশ অক্ষর অমিত্রছন্দে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র কাব্য 'প্রান্তিক' এ অপার রহস্যময়তার প্রতি কবির অভিযাত্রা এবং যুদ্ধবিরোধী কবির অপরূপ বৈরাগ্যের ছবি ধরা পড়েছে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থে সংস্কারমুক্তির কথায়, 'আকাশ প্রদীপে' কৈশোর স্মৃতির রোমন্থনে, 'নবজাতক'-এ আত্মঘাতী সভ্যতার বীভৎসতার প্রতি ধিক্কারে কবি মুখর। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে', কবি জীবনের সার্থকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে পরমশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকালের শেষ দশ/বারো বছরের সময়কালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন পর্যায়ের রেখাপাত হতে শুরু করে। এই রেখাপাত অবশ্য অবিমিশ্র ছিল না। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতির ফলে এবং '...গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে'—কিছুটা এর ফলেও 'অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ'[১]। ফলত করুণানিধান, কিরণধন, যতীন্দ্রমোহনের মতো অনেক কবি বহু সুপাঠ্য ও উপভোগ্য কবিতা লিখেও বিস্মৃত হয়ে গেলেন, ঢাকা পড়ে গেলেন রবীন্দ্র বলয়ে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর হওয়ার একটা চেষ্টা শুরু হলো। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো—এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হলো'[২]। নতুন কবিদের সমস্যাটাই ছিল সাবালকত্ব অর্জনের সমস্যা, নিজের নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। ফলে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার লড়াইটা শুরু হয়েছিল হয়তো এভাবেই, পাশাপাশি সমিধ জুগিয়েছিল তখনকার সামাজিক অবস্থা আর অন্যভাষার সাহিত্যিক দর্শন ও নিদর্শন।

প্রথম পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের হাতে শুরু হয়েছিল এই রবীন্দ্রবলয় অতিক্রমের প্রয়াস। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম দিকের তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'হোমশিখা'র পর 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা' আর 'তুলির লিখন'-এ এসে সত্যেন্দ্রনাথকে স্বকীয় ও বিশিষ্ট রীতিতে পাওয়া যায়; ধ্বনিচিত্রের একাত্মতা, স্নিগ্ধ মাধুর্যের স্বাদ, রূপরঙের সঙ্গে ছন্দের নিপুণ ব্যবহার আর বিচিত্র শব্দপ্রয়োগে যে কাব্যিক জগৎ তিনি নির্মাণ করলেন, তা একেবারেই অ-রাবীন্দ্রিক। যতীন্দ্রনাথ নি:সন্দেহে নিজস্ব ভাষায় রচনা করেছিলেন তাঁর কাব্যিক ভুবন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই কবি জীবনকে মূলত নিরাশাবাদী বস্তুমূলক নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর এই দেখাকেই বাক্‌সংযমের মধ্যে, আত্মসচেতনতার আতিশয্যে, তীব্র কৌতুকে এমনভাবে রূপায়িত করেন, মনে হয় তিনি সদর্থেই পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'মরুশিখা', 'সায়ম' ইত্যাদি। যতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও কবিস্বভাবে অনেকটাই আলাদা মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। মোহিতলালের কাব্যে ধ্বনিত হল দেহবাদ, ভোগবাদ,

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও রোমান্টিক বিষণ্ণতাবোধ। চার্বাকপন্থী লোকায়ত দর্শনের জীবন সম্পৃক্ততা ও বীরাচারী সাধনার বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদের সঙ্গে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তিমানুষের অসহায়তাবোধ। আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর কবিতা ক্লাসিকগন্ধী এবং স্তবক নির্মাণে ভাস্কর্যধর্মী। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দেবেন্দ্রমঙ্গল', 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', হেমন্ত গোধূলি', 'ছন্দচতুর্দশী' উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল সম্ভবত সচেতনভাবেই সরাসরি রবীন্দ্র সমালোচনার পথে না গেলেও রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ নিজস্ব কাব্যজগৎ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আর কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৮-১৯৭৬) ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবত স্বত:স্ফূর্ত প্রাণোন্মদনা। বস্তুত, অন্যান্য নাগরিক, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কবিদের তুলনায় তাঁর জীবন ও প্রতিবেশ এতটাই আলাদা ছিল যে, সমসময়ের সাহিত্যধারা, এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। শৈশবেই লেটোগানের দলে প্রবেশের সুবাদে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ, বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ভাগ্য অন্বেষণ, অসমাপ্ত পড়াশুনো এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান তাঁকে যে বিচিত্র, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল, নিজস্ব কবিত্ব প্রতিভাবলে তাকেই তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। কলকাতায় ফেরার পর সাম্যবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ইংরেজ-বিরোধিতা তাঁর কবিতার গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দেয়। সমসাময়িকতা তাঁর এই সময়ের অধিকাংশ কবিতার প্রাণ হলেও সেখানে তাঁর স্বাধীনতাকামী, মানবতাবাদী, রাজনীতি-সচেতন অথচ রোমান্টিক কবি মনেরই প্রকাশ ঘটেছে।

আসলে নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহ ও বীর্যের যে হুঙ্কার তা কবিমনের রোমান্টিকতারই প্রকাশ। সে রোমান্টিক মন ক্রিয়াশীল থাকে, যখন নজরুল লেখেন প্রেমের আর প্রকৃতির কবিতাগুলি। প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাস রয়ে গেছে তাঁর সব কবিতাতেই। রাজনৈতিক চেতনা ও বিদ্রোহের দীপ্তি, হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্বের কথা, সাম্যবাদ, কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সমর্থনে এবং শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতাগুলি মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। 'বিদ্রোহী', 'ফরিয়াদ', 'সাম্যবাদী' 'অন্ধ স্বদেশ', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'কুলিমজুর' নজরুলের জনপ্রিয়তম কবিতা। অন্যদিকে 'গানের আড়াল', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'আমি গাই তারই গান' কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অদ্ভুত মনোরম সমাবেশ। আবার এই চিরবিদ্রোহী মানুষটির অন্তরে ভক্তির অনবদ্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শ্যামাসংগীত আর ইসলামি গান থেকে। আগমনী বিজয়ার গান, গজল, মারিফতি, মুর্শিদি, ঠুংরি, ভাটিয়ালি—বাংলার প্রায় সবরকম গানই তিনি লিখেছেন ও সুরে বেঁধেছেন। সেখানেও মানুষের কথা, প্রেমের কথা, প্রকৃতির কথা। 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'বিষের বাশী', 'ভাঙার গান', 'ছায়ানট', 'ফণিমনসা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রনাথের মরুভূমির মতো বাস্তব পৃথিবী, মোহিতলালের ধ্রুপদী দেহবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সৌন্দর্য ও ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য আর নজরুলের চড়া গলার পরে 'বাংলা কবিতায় দেখা দিল সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত'[৩]। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে আর বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে সম্প্রসারিত করেছিলেন অনেকখানি। প্রাথমিক পর্বে প্রথম চারজনের ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মনন ও চিন্তা তার সঙ্গে ইতিহাসবোধ, সময় আর নাগরিকতার মিশেলে দ্রুতই পালটে যাচ্ছিল বাংলা কাব্যের ধরন। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর পর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও রূপসী বাংলা'য় নিসর্গের উজ্জ্বলতাকে তিনি নিয়ে এলেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, আবার একই সঙ্গে স্থাপন করলেন আবহমান

কালে। খাঁটি বাংলাভাষায় দেশজ শব্দে এমন এক ঈষৎ বিষাদমিশ্রিত মৃত্যু চেতনাসম্পন্ন দৃশ্যপট তৈরি করতে থাকলেন যা পাঠককে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই সবের সঙ্গে অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকে যুক্ত করলেন বর্তমানের সঙ্গে, প্রসারিত করলেন সময় চেতনার বলয়কে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে। পরবর্তী সময়ে তিনি যত এগিয়েছেন 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'র দিকে, ততই ইতিহাসবোধ ও সময়চেতনার ভিতরে এসেছে সমসাময়িক সময়ের চাপ। স্বাধীনতার আগে পরে দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধবিধ্বস্ত নগর সভ্যতার মনমানসিকতা সবই ভিড় করছিল আর এখান থেকেই তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা, যদিও শেষপর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতে চান 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনা দিন'কেই।

'কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে মলমাস'—সুধীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতাই মানবেতিহাসের মলমাসেরই প্রতিচ্ছবি। বন্ধ্যাত্ব, অক্ষমতা নিস্ফলতাবোধ তাঁর কবিতার প্রধান কথা। এই নি:সঙ্গতা ও একাকীত্ব ইতিহাসের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত বলেই তা তাঁর কবিতায় নিয়তিবাদের রূপ নিয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় খুঁজে পাননি কোনো স্থিরকেন্দ্র, সবই আপেক্ষিক নৈমিত্তিক। তাই বুদ্ধদেব বসু বলেন যে ....অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী ও উত্তরফাল্গুনী, এ তিনখানা আসলে একখানাই বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়, তিনটি বইয়ের ভিতর দিয়ে একটি কথাই তিনি বলেছেন। আবার সমবয়সী হলেও অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে একেবারে আলাদা। অমিয় চক্রবর্তী প্রশান্তির কবি এবং তিনিই একমাত্র আধুনিক যাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশ লালিত হয়েও স্বতন্ত্র। 'খসড়া', 'একমুঠো'য় জগৎ ও জীবনকে দেখার ইচ্ছে, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায় মানুষের মন, কখনো স্মৃতিভাবনা কখনো বা সামগ্রিক সংসারের ছবি। কিন্তু 'মাটির দেওয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত' 'দূরযানী'তে দেখা দিলো গভীর ধ্যানের চিন্তা ও চেতনার জগৎ। শেষপর্বে অর্থাৎ 'পারাবার', 'পালাবদল' থেকে 'পুষ্পিত ইমেজ'-এ আছে বিশ্বের নানা স্থানে ভ্রমণের ফলে আধুনিক বিশ্বজীবন। স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর জীবন অন্বেষণ কবিতায় এনেছে ব্যাপ্তি, হতাশা ও নিরাশার জগৎ থেকে উত্তরণের দিশা।

কাব্যগ্রন্থের সংখ্যার দিক থেকে, বিস্তারের দিক থেকে, চেতনার নানা পর্যায়ের বাঁকবদলের দিক থেকেও এক দীর্ঘ ব্যাপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা লিখে গেছেন বিষ্ণু দে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রেমচেতনাই প্রধান সুর এবং পরবর্তী 'চোরাবালি', 'পূর্বলেখ' কিংবা 'সাত ভাই চম্পা' তেও সে সুর বেজেছে, কিন্তু পাশাপাশি এসেছে 'দেশের জনসমাজের সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা'ও। যে-ভূপ্রকৃতি তাঁর কাব্যে বারে বারে ফিরে এসেছে তা যেমন সাঁওতাল পরগনার দ্বন্দ্বময় নিসর্গ-ভূমি, তেমনি মেঘ, বিদ্যুৎ, নদী, ঝড়ের প্রতীকে তিনি জীবনের নাট্যময় অধিদেবতাকেই আহ্বান করেছেন বারে বারে। দেশজ কাব্য ও রূপকথার লৌকিক সংস্কৃতির শৈল্পিক সজ্ঞানতাকে কাব্যে ব্যবহার করে বিষ্ণু দে-ই হয়ে উঠলেন আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম এবং একামাত্র কবি যিনি মহাকবির মন নিয়ে শিল্পে ব্যক্তিত্ব মুক্তির সাধনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' থেকেই রোমান্টিক, কামনার প্রকাশে পরবর্তী 'কঙ্কাবতী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পেরিয়ে জীবনের শেষপর্যন্ত সঙ্কোচহীন। তবে শেষের দিকে কবিতায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। এ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' এবং 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' নি:সন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের সঙ্গেই আসে সমবয়স্ক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিত দত্তের নাম। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ ও প্রেম, যতীন্দ্রনাথের বিদ্রুপ, মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ, জীবনানন্দ-সুধীন-বিষ্ণু-অমিয়-বুদ্ধদেবের অসামান্য মননশীলতার পাশেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আকর্ষণ করেছিলেন কাব্যপাঠকের দৃষ্টি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'র 'বেনামী বন্দর', 'মাটির ঢেলা', 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাগুলির নতুনস্বাদ, বন্ধন ছিন্ন করতে চাওয়ার সঙ্গে ভৌগোলিক চেতনা, কখনো নগর জীবন আবার আকাশের তল্লাশ নিয়ে সাগর থেকে ফিরে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সুবিশাল সমুদ্র চেতনা। 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'কখনো মেঘ', 'হরিণ, চিতা, চিল' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলেও তাঁর 'সাগর থেকে ফেরা' জনপ্রিয়তম। তুলনায় অজিত দত্ত মৃদুভাষী এবং একান্তভাবে প্রেমের কবি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁর প্রেমের ভাষা দুর্জয় আবেগে উচ্ছ্বসিত নয়, এবং সনেটের বন্ধনে সংযত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' এবং তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে রয়ে গেলেন কুসুমের মাসের কবি বলেই, যদিও 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্নবা' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রেম ও প্রসন্নতার নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে ক্রমেই সাবালক হয়ে উঠল বাংলা কবিতা। ত্রিশের দশকের সময় থেকেই বাংলা কবিতায় এল বিপ্লবী আধুনিকতার ধারা। ধনতন্ত্র- ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যাদ-বিরোধী সাম্যবাদী ধারণার উপর আস্থা স্থাপন করে গণমুখী রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত ঘটল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ এ পথেই কাব্যসাধনা করেন। এই নাগরিক জীবনের মরুভূমিসম অসাড়তা, বন্ধ্যাত্ব জীবনানন্দের হাতেই রূপ পাচ্ছিল, সুধীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে প্রায় নিয়তির স্থানে দিয়ে গেলেন আর সমর সেন তাকে স্থাপিত করলেন তাঁর কবিতার কেন্দ্রে। সমর সেন মেধা আর অসাধারণ গদ্যের সুষমায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিলেন, কিন্তু তিনি থেমে গেলেন কিছুদিনের মধ্যেই। এই স্বল্পসময়ের পদচারণাতেই তিনি রয়ে গেলেন বিশিষ্ট হিসেবে। 'ম্লান হয়ে এল রুমালে/ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ—/হে শহর হে ধূসর শহর!/কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও/লম্পটের পদধ্বনি/কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও/হে শহর হে ধূসর শহর!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট করেই তো 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে বলেছিলেন 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। ছন্দের তৎপরতায়, শ্লোগানে, সরল ভাষায় প্রতিবাদী কবিকণ্ঠ হিসেবে রাজনৈতিক জীবনযাপনের পাশাপাশি তিনি কবিতা লিখে চললেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করলে, এমনকি তাঁর দীর্ঘজীবনে যাঁদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, সেই সহযোদ্ধাদের নিদারূণ স্খলনও শেষপর্যন্ত তাঁর চিরপ্রতিবাদী চেতনার হাত থেকে রেহাই পেল না। মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দিনেশ দাস, রাম বসু সমাজ ও রাজনীতির কথাই বলে গেলেন নির্দিষ্ট মতবাদে আস্থা রাখে।

তিরিশের মননশীলতা আর চল্লিশের সমাজবিবেক মিশে গেছে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। ব্যক্তিগত অনুভব আর প্রখর বিবেক নিয়ে শিল্প-প্রগল্‌ভতা বা রাজনৈতিক-প্রগল্‌ভতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মিতভাষ্যে কিন্তু দৃঢ়স্বরে কবিতা লিখলেন। ফলত 'পঞ্চাশ দশকের প্রধান কবি'র তকমা সরিয়ে ক্রমশই হয়ে উঠতে লাগলেন বিশ শতক ও পরবর্তী সময়ের মহৎ কবি। পৃথিবীর নিহিত রহস্যের সন্ধানী, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, লৌকিক ধর্মকে আধুনিক কাব্যভাষ্যে প্রকাশ করেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতার ফর্ম, প্রধানত ভাষা নিয়ে দীর্ঘ পরীক্ষায় রত এই আধুনিক মরমী কবি। বুদ্ধদেব বসু যে শুদ্ধ কবিতার ধারাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে ধারায় লিখলেন অরুণ কুমার সরকার, নরেশ গুহ থেকে বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসুরা।

নারী, নিসর্গ আর কবিতা মিশে গেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়, অন্যদিকে নির্বেদ, বিতৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা জীবনের ছন্দে, আস্তিক্যবোধে বিধৃত। আর প্রকৃতির মগ্ন কবি আলোক সরকার আকর্ষণ বোধ করেন, 'প্লাবিত সুন্দরতা, বিস্ময়, আনন্দের তরঙ্গিত উচ্ছ্বলতা'র প্রতি। আত্মার গহনে ডুব দিয়ে এক নিবিড় অভিজ্ঞতার কথাই বলেন উৎপলকুমার বসু।

এই সময় থেকে জীবনযাপনেও মিশে যাচ্ছিল কবিতার মতোই এক স্বাতন্ত্র্য। তার প্রকাশও হয়ে উঠতে চাইল বহুমুখী। আর বহুমুখিতার প্রকাশ আশ্রয় পাচ্ছিল একের পর এক প্রকাশিত 'ছোটো পত্রিকা'য়। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলির ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৃত পক্ষে যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, ফর্মের ভাঙা-গড়া, বক্তব্যের সাহসী প্রকাশ-সবই ধারণ করে আছে কলকাতা আর এ রাজ্যের জেলাগুলি থেকে প্রকাশিত অসংখ্য ছোটো পত্রিকা। কবিতা গল্প, উপন্যাসের নতুনত্বের ক্ষেত্রে এবং বাংলা কবিতার বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে খুব বড়ো ঋণ রয়ে গেল এঁদের কাছে।

বাংলা নাটক ও যাত্রার ধারা :

ভারতবর্ষে নাটকের সূচনা বহুকালপূর্বে। এমনকি ঋগ্বেদের কোনও কোনও সূত্রেও নাট্যক্রিয়ার বীজ চিহ্নিত রয়েছে। পরবর্তীতে উপনিষদ বা মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধেও এ কথা খাটবে। আর কালিদাস, ভাস, শূদ্রক প্রমুখ জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাট্যকৃতি আজও সংস্কৃত নাটকের সুমহান নাট্য-ঐতিহ্যের সাক্ষ্যবহনকারী। পরবর্তী সময়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি গঠনের যুগেও লোক জীবনে নাটকের যোগ ছিল অঙ্গাঙ্গী। চর্যাপদে পাবো 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।/বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।।" অর্থাৎ, 'বজ্রাচার্য নাচছেন আর দেবী গান গাইছেন, এর ফলে বুদ্ধনাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল। তৎকালীন বঙ্গ সমাজে নাটগীতির পালা অভিনয়ের সপক্ষে এই পদটি একটি জোরালো প্রমাণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে একেও নাটগীতিই বলতে হয়। পরবর্তী সময়েও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। পালাগান, কীর্তন কিংবা পাঁচালির মধ্যেও বিবিধ চরিত্র এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরের ঢঙে সংলাপ ও গান পরিবেশনে নাটগীতির বহমানতার পরিচয় পাবো। অন্যদিকে পুতুল নাচ, ছৌ, কালীকাচ, আলকাপ বা গম্ভীরার মতো লোকশিল্পেও নাট্য সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, আর বাংলার নিজস্ব নাট্যমাধ্যম যাত্রার কথাও এপ্রসঙ্গে ভুললে চলবে না। এই নাট্যকলার মূলে বৈদিক কালের নাট্যাঙ্গিকের অবশেষ আবিষ্কার করেছেন কেউ কেউ; অনুমান করা হয় প্রথম পর্যায়ে সূর্য-ই ছিলেন যাত্রা-কাহিনির অধিদেবতা, পরে কৃষ্ণযাত্রা এবং আরও পরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়। এই বিদ্যাসুন্দর নিয়েই কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রাদল বাঁধেন বহুবাজারের রাধামোহন সরকার। গোপাল উড়ে এই যাত্রাদলে গান করে সুবিখ্যাত হন। এরও পূর্বে শিশুরাম অধিকারী অথবা শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ প্রমখের কীর্তি স্মরণীয়। কিন্তু আধুনিক অর্থে আমরা যাকে থিয়েটার বলি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের স্বদেশি নাট্যমাধ্যম থেকে তা সহজ ও স্বত:স্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটকের বিষয়ও ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙালির রসদৃষ্টি ইংরাজি নাট্যাঙ্গিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশদেশবাসী গেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় প্রথম 'দ্য ডিসগাইজ'-নামক একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়ে বাঙালি নটনটীদের দিয়ে অভিনয় করান, গোলোকনাথ দাসের অনুবাদে এর নাম হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদল', ১৭১৬-এ আর একবার অভিনয়ের পর বিভিন্ন কারণে লেবেদেফের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কেবল একদিক খোলা মঞ্চ বা 'প্রসেনিয়াম'-রীতিতে বাঙালির চেষ্টায় প্রথম নাট্যাভিনয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে। ১৮৩৫-এ শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে অভিনীত হয় দেশীয় নাটক 'বিদ্যাসুন্দর', সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ যেমন এই সময়েই শুরু হয় তেমনই ইংরাজি আদর্শে নাটক রচনার চেষ্টাও প্রবলতর ছিল। ১৮৫২-র লিখিত যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি বিলাস' যেমন ট্রাজেডি ও বিশেষত শেক্স্‌পিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের ছায়ায় রচিত, ঐ সালেই লেখা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' তেমনই প্রথম কমেডি লেখার প্রয়াস। হরচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন চারটি নাটক। শেকস্‌পিয়রের 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস'-অবলম্বনে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), মহাভারতের গল্প নিয়ে 'কৌরববিয়োগ' (১৮৫৮), শেক্স্‌পিয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪) এবং ব্রহ্মদেশের কাহিনি নিয়ে 'রজতগিরি নন্দিনী' (১৮৭৪)। এরপর নাম করতে হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণের। তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) শিক্ষিত বাঙালি সমাজে কৌলীন্য প্রথার নিরসনে অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তাঁর সংস্কৃত নাট্যানুবাদের মধ্যে পড়ে 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতীমাধব' (১৮৬৭)। পুরাণাশ্রিত বিষয়ে তাঁর মৌলিক নাটক তিনটি—'রুক্মিনীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫)। তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত 'নবনাটক' বা 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নাটক এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সংকট' ও 'চক্ষুদান' প্রহসনগুলি তিনি রচনা করেন।

রামনারায়ণের অনুকারীদের মধ্যে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক' (১৮৫৯), শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ' (১৮৬০) এবং নফরচন্দ্র পালের 'কন্যাবিক্রয় নাটক' উল্লেখ্য। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন-সিদ্ধ হলে ঐ বছরেই উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'বিধবাবিবাহ' নাটকটিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'-নাটকের অভিনয় দেখে অতৃপ্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় রসোত্তীর্ণ নাটক রচনায় অভিনিবেশ করেন। তাঁর এই চেষ্টার সার্থক ফল প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। মহাভারতের কাহিনি ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকের মেলবন্ধনে এটিই আধুনিক বাংলাভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১৮৬০-এ লেখা 'পদ্মাবতী' গ্রিক পুরাণের 'apple of discord'-এর কাহিনি নিয়ে রচিত। অন্যান্য কারণ ছাড়াও এই নাটক স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে। তবে মধুসূদনের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তাঁর রচিত দু'টি প্রহসনে। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' লেখার সমসময়েই রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এই দুটি প্রহসনে সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নৈতিক ব্যাভিচার ও আধুনিকতার নামে উৎকট উন্মার্গগামী কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই কপট ধার্মিক ধনাঢ্য বৃদ্ধের দুরাচরণও তার সমস্ত ন্যক্কারজনক হাস্যকরতা নিয়ে উঠে এসেছে। উনিশ শতকের 'বাবু' সংস্কৃতির এর চেয়ে ভালো প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে আর হয়েছে কি না সন্দেহ। মধুসূদনের শেষ উল্লেখ্য নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) টড্-এর লেখা রাজস্থানের ইতিহাস কথা অনুসরণে রচিত। রাজা জয়সিংহ এবং মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলি উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজিক মৃত্যুই এই নাটকের উপজীব্য। এছাড়া মৃত্যুর আগে 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক তিনি লিখে শেষ করলেও 'রিজিয়া' নাটকটি অসম্পূর্ণই ছিল।

মধুসূদন পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের ধারায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আসন দীনবন্ধু মিত্রের। ১৮৬০ সালে 'কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্' ছদ্মনামে লেখা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সার্থক প্রতিফলন 'নীলদর্পণ'